হিরণ্যগড়ের বন্ধু

চিত্তরঞ্জন মাইতি

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮ : ৮ই মে, ১৯৬১

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১
১ আন্সারী রোড, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

মুদ্রক :
জয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড (মুদ্রণ বিভা
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলকাতা-৬

গীতা

স্নুচরিতাস্নু—

এসো এসো।

অ্যানা হেপবার্নের হাত ধরে অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছে রাজা রায়।

আজ সব সেজের বাতি নিভিয়ে দিতে বলেছি রাজা। এই রাতে তোমার হৃদয়ে রোশনাই জ্বলছে না?

রাজা রায় উঠছে, পা দুটো কাঁপছে তার। হিরণ্যগড়ের ছোটকুমার বাহাদুর আজ এক বন্দী বিহঙ্গ।

অ্যানা, মনে হচ্ছে আমি এক অগ্নিশিখা স্পর্শ করে রয়েছি। যে দীপ্তি দেয়, পথ দেখায়, আবার দাহের জ্বালা ধরিয়ে দেয় সারা দেহে।

হাসির তরঙ্গ তুলল অ্যানা হেপবার্ন। দুর্গের মত গোলগম্বুজে কতক্ষণ তা ফিরে ফিরে বাজল। রাজা রায়ের হৃদয়কে বার বার সে আঘাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল।

আজ তোমাকে আমার সব সেরা রত্নটি দেব রাজা। আমার বড় দুঃখের, বড় যন্ত্রণার সঞ্চয় সেটি।—রাজাব কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল অ্যানা।

রাজা রায় অনুভব করল পায়ের তলা থেকে তার শেষ সিঁড়িটা সরে গেল। আঁকাবাঁকা বারান্দা পেরিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল যেখানে সেটি সম্ভবতঃ অন্দরমহলের একটি শয়নকক্ষ।

অতি সন্তর্পণে অ্যানা রাজার হাত ধরে ঢুকল সেই ঘরে। রহস্যময়ী অ্যানা। ইশারায় শব্দ করতে বারণ করল রাজাকে। বাইরের জ্যোৎস্না রাত্রিকে দূরে সরিয়ে রেখেছে অ্যানা, ঘরখানিকে নিশ্ছিদ্র করে।

কিছু দেখতে পাচ্ছ? ভাল করে চেয়ে দেখ তো দেখি।

রাজা রায় তাকিয়ে রইল সেই অন্ধকারে। হাত ছেড়ে দিয়েছে অ্যানা।

দেখ দেখি চেয়ে কোন হারানো রত্নের সন্ধান পাও কিনা?

জ্বলছে, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, রাজা রায়ের বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার, চরম সম্মান—হারানো হীরক অঙ্গুরীয়।

অন্ধকার সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অতীতের আর এক মহলে প্রবেশ করল হিরণ্যগড়ের কুমার বাহাদুর।

অ্যানা আজ দর্শক। সে চোখের ওপর দেখছে হাসিকান্নার এক নাটক। রঙ্গমঞ্চের পর্দাটা ধীবে ধীরে সরে গেল।

আঠারোশ' আটচল্লিশ সালের এক মধ্যাহ্ন। শেষ হেমন্তের বিষণ্ণ একটি দিন সহসা দুরাগত বাদ্যের ঝংকারে সজীব হয়ে উঠল। ক্রমে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল সে ধ্বনি। শাল শিমুলের জঙ্গল পেরিয়ে একটি মিছিল এসে দাঁড়াল সুবর্ণরেখাব তীবে। ওপারে হিরণ্যগড়, এপারে ওডেন সাহেবের নীলকুঠি।

বিশাল গম্বুজওয়ালা কুঠি তৈরি করিয়েছিলেন ওডেন হেপবার্ন। সম্প্রতি অনিবার্য কোন কারণে বিপত্নীক ওডেন স্বদেশে রওনা হয়ে গেছেন। একমাত্র কন্যা অ্যানা হেপবার্ন বর্তমানে সেই নীলকুঠির পরিচালিকা এবং অধিকারিণী।

বয়সের তুলনায় অ্যানা প্রখব বুদ্ধিমতী। স্থির বিবেচনায়, কঠোর দৃঢ়তায় সে করে দেয় বহু জটিল বিষয়ের সমাধান। কিন্তু নারীর একটি স্বাভাবিক কৌতূহল আছে। এখানে সে কিশোরীর মত চঞ্চলা। কোন অনুষ্ঠান বা উৎসবের গন্ধ পেলে সে নিজেকে সংযত করে রাখতে পারে না।

অ্যানা বাদ্যের শব্দে নীচের হলঘর থেকে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো চিলেকোঠায়। গোলগম্বুজের একটি ছোট্ট জানালা খুলে গেল। অ্যানা দেখল সুবর্ণরেখার ওপারের চরে এসে দাঁড়িয়েছে একটি বরযাত্রীর দল। সামনে রাঙা লাঠি হাতে নিয়ে বিচিত্র সাজে সজ্জিত একদল পাহারাদার। তাদের ঠিক পেছনে একদল বাদ্যকার। বাদ্যকারের পরেই সাদা ঘোড়ার পিঠে জরিদার কুর্তা পরে এক অশ্বারোহী, মাথায়

তার পাগড়ি। হাতে খোলা তলোয়ারখানা মধ্যাহ্নের আলোয় ঝলকে উঠছিল।

ঠিক তার পেছনেই একটি সুসজ্জিত হাতি। হাওদার ওপর রূপোর কাজ করা ছাতার নীচে বসে রয়েছে বর। তার পেছনে দশ-বিশজন অশ্বারোহী। পদচারী মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

অ্যানা বুঝল হিরণ্যগড়ের কোন কুমারের বিবাহযাত্রা এটি।

ধীরে ধীরে নদী পার হল বরযাত্রীর দল। তারপর তরঙ্গিত শাল অরণ্যের পাশ দিয়ে দূর পাহাড়ের কোলে কোন গ্রাম নিশানা করে চলে গেল।

মিলিয়ে গেল বরযাত্রীর দল, কিন্তু অ্যানা চেয়ে রইল তাদের চলে যাওয়ার পথের দিকে। মন তার উদাস হয়ে গেছে। অস্পষ্ট স্মৃতির জানালা খুলে সে দেখছে স্কটল্যাণ্ডের এমনি এক কঙ্করময় প্রদেশ। অনেক ছোটবেলায় সে দেখেছে সেই ছবি। আজ মনে হচ্ছে, আসে না কোন অশ্বারোহী পুরুষ, যে তাকে সবলে দস্যুর মত ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে দূর কোন নদীতীরবর্তী জনহীন প্রান্তরে! সেখানে ঘর বাঁধবে সে। গড়ে তুলবে তার স্বপ্নে দেখা প্রাসাদ।

খুব ছোটবেলায় বাংলাদেশে এসেছিল অ্যানা। বাবা ওডেন হেপবার্ন কোম্পানির কাজ নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। মা মারা গিয়েছিলেন এ দেশেই। বাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই অ্যানা ঘুরেছে বহু জায়গায়। অবশেষে ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হলেন হেপবার্ন পরিবারের ওপর। বাংলাদেশের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে এসে নীলের ব্যাবসা শুরু করলেন হেপবার্ন। ধীরে ধীরে ফেঁপে উঠল ব্যাবসা। আঠারোশ' তেত্রিশে আইন পাস করে ইউরোপীয়দের জমি কিনে কুঠি বানাবার অধিকার দিয়েছিলেন সরকার বাহাদুর। সেই সুযোগ দুর্লভ সৌভাগ্য এনে দিল ওডেন হেপবার্নের কাছে। ওডেন আটশ' বিঘা জমি কিনলেন। এ অঞ্চলের জমিদার রাজা উপাধিধারী দুর্লভ রায় তখন জটিল কি এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। অর্থের প্রয়োজন ছিল তাঁর। এগিয়ে

এলেন ম্যাডেন সাহেব তাঁকে সাহায্য করতে। অবশ্য এই সাহায্যের ব্যাপারটি একেবারে নিঃস্বার্থ ছিল না। বিনিময়ে দুর্লভ রায়ের একরকম নিরুপায় অনিচ্ছাতেই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেন এই আটশ' বিঘের বাঁধবন্দী প্লটটি। সেই থেকে হেপবার্ন পরিবার রয়েছেন এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে। বর্তমানে নীলকুঠির মালিক হেপবার্ন এ অঞ্চলেব সেরা ধনী বলে খ্যাতিলাভ করেছেন।

কিন্তু যতই খ্যাতি বাড়ছে হেপবার্নের, মানসিক শান্তি ততই নস্ট হচ্ছে হিরণ্যগড়ের বর্তমান রাজা দুর্লভ বায়ের। তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেদিনের কথা, যেদিন হেপবার্ন তাঁর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সুবর্ণবেখার বিরাট একবন্দীর প্লটটি লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

রাজা দুর্লভ রায় সরকারের সঙ্গে চুক্তিপত্র কবে নীল ব্যাবসাব পত্তন করলেন। তখন দেশীয়দেরও নীলের ব্যাবসার সুযোগ দিয়েছেন সরকার। দুর্লভ রায় হয়তো এই নতুন বাণিজ্যে নামতেন না, কিন্তু আগের ঐ ক্ষতটিকে নিরাময় করার উপায় বলে মনে হল এই প্রচেষ্টা। ছোটকুমার রাজা রায় দাদাকে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী দুর্লভ রায় ভাইয়ের এই পরামর্শকে মৃদু হেসে সরিয়ে দিয়েছিলেন একপাশে।

বৈষয়িক ভাবনাটা ছিল অগ্রজসূত্রে দুর্লভ রায়েরই প্রাপ্য। ছোট-ভাই রাজা রায়ের বিষয়-আশয়ে যতখানি আকর্মণ ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল সংগীত সাধনায়। সুতবাং দাদা দুর্লভ রায়কেই দেখতে হত সবকিছু বৈষয়িক কাজ। উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা রায় পেয়েছিল একটি দুর্লভ বস্তু, একখণ্ড অতি মূল্যবান হীরক। রায়বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান পেত রাজা উপাধি আব পরবর্তী সন্তানের অংশে পড়ত ঐ হীরকখণ্ড। দুর্লভ এই হীরেটিকে দেওয়া হত কনিষ্ঠা বধূর আশীর্বাদীর লগ্নে। তাকে বিয়ে করে যেদিন নিয়ে আসা হত ঘরে সেদিন লক্ষ্মী প্রবেশ করতেন রায়-পরিবারে। আর সন্তান একটিমাত্র হলে তিনি হতেন বিষয় ও হীরক উভয়েরই অধিকারী।

এই রীতি বহুদিনের। এ বিশ্বাস মিশে ছিল রায়বংশের রক্তের সঙ্গে।

সেদিন ছিল ছোটকুমার রাজা রায়ের বিয়ের দিন। অ্যানা তাই দেখছিল নীলকুঠির গোল-গম্বুজের জানালা থেকে।

এক আশ্চর্য মেয়ে এই অ্যানা হেপবার্ন। দেহে ছিল তার স্কচ রক্তের ধারা, কিন্তু সংস্কারে সে ছিল পুরোদস্তুর ভারতীয়। শৈশব থেকে সে মিশেছে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। এই মেলামেশায় কোনদিন বাধা দেননি ওডেন সাহেব। মাতৃহীন কন্যাটিকে দিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করাতে চাননি তার বাবা।

অ্যানা বাঙ্গালীদেব সঙ্গে মেলামেশার ফলে চমৎকার বাংলা বলতে পারত। কিছুকাল আগে ওডেন এ দেশেই এক মেমসাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন। নতুন প্রণয়িনীর অনুবোধে যখন তিনি 'হোমে' ফিরতে মনস্থ করলেন তখন সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন স্নেহের কন্যাটিকে।

এ দেশ ছেড়ে যেতে চায়নি অ্যানা। 'হোমের' বিশেষ কোন স্মৃতি বা মোহ ছিল না তার মনে। শৈশবের এই দেশ, এই পরিবেশকেই সে স্বদেশ বলে ভাবতে শিখেছিল।

থেকে গেল অ্যানা একাকী এই দেশে।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। হেমন্তেব হালকা কুয়াশার আড়ালে চাঁদের আলো কেমন যেন রহস্যে ভরা বলে মনে হচ্ছিল। চারদিকে পাঁচিল-ঘেরা বিরাট বাগান। অ্যানা আপনমনে ঘুবতে লাগল। আজ কেমন এক অন্যমনস্কতা তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এদেশীয় কতকগুলো ফুল আর ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন ওডেন সাহেব তাঁর বিখ্যাত বাগানটিতে। গন্ধ ছড়াচ্ছিল কোন ফুল। অ্যানা আবছা অন্ধকারে থমকে দাঁড়াল। বুক ভরে আঘ্রাণ নিল। কাঁপছে অ্যানা, যেন কোন দুর্লভ খবর এসেছে তাব কাছে এই ফুলের গন্ধে। একা একা পায়চারি করল কতক্ষণ। পোষা হরিণগুলো বাগানের ভেতরে তাদের নির্দিষ্ট আস্তানায় চলে গেছে। দু'একটা খরগোশ তখনও ছুটোছুটি করছিল ইতস্ততঃ। অ্যানা ফিরে আসছিল, হঠাৎ দেখল একটি

দীর্ঘ নারকেলশরের গাছ ছায়া ফেলেছে মাটিতে। বড় নিঃসঙ্গ লাগল তার নিজের নিজেকে। গাছটি একা নয়, তারও ছায়াসঙ্গী রয়েছে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় বিক্ষত হতে লাগল অষ্টাদশী অ্যানা হেপবার্ন।

কতক্ষণ এমনি একা একা কাটিয়ে ফিরে এলো অ্যানা। নায়েব গোমস্তাদের কাছে হিসেবপত্র পরীক্ষা করতে বসল। এ অভ্যেস তার বহুদিনের। কিন্তু মন বসাতে পারল না কাজে। সবাইকে ছুটি দিয়ে উঠে এলো ওপরে। খাওয়ার পাট চুকল তাড়াতাড়ি। কুঠির সব আলো নিভিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে চলে এলো অ্যানা শোবার ঘরে।

ম্লান জ্যোৎস্নার একফালি আলো এসে পড়েছিল খোলা জানালা দিয়ে। ধীরে ধীরে অ্যানা এসে বসল পিয়ানোর কাছে। বেজে উঠল সুর; মৃদু করুণ একটা সুর কতক্ষণ ধরে বাজতে লাগল। কাঁপতে লাগল হেমন্তের রাত, কাঁপল বিরহী অ্যানা হেপবার্নের নিঃসঙ্গ হৃদয়।

কখন বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল অ্যানা, কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মনে নেই। সহসা কিসের একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। চাঁদের আলো তখন একেবারে ম্লান হয়ে এসেছিল। স্পষ্ট কিছু ঠাওর করা গেল না।

অ্যানার শোবার ঘর ছিল নীলকুঠির এক প্রান্তে। সেখানে সুবর্ণরেখা বাঁক নিয়ে চমৎকার একটি হাঁসুলির সৃষ্টি করেছিল। এখান থেকে পাহাড়ী প্রান্তরের সুন্দর একটি ছবি চোখে পড়ে। শাল মহুয়ার জঙ্গল ক্রমশঃ উঁচু হয়ে মিশে গেছে দূর দিগন্তে। সেখানে আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে নীল পাহাড়।

অস্পষ্ট আলোয় কোনকিছু দেখা না গেলেও অ্যানা শুনতে পেল দু'চারখানা নৌকোর জল কেটে কেটে আসার শব্দ। তারপর একটা কিছু যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। আরও কয়েকজন মনে হল জলে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। তোলপাড় চলল কিছুক্ষণ। অ্যানা কিছু দেখতে

পেল না, কিন্তু মনে হল কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এত গভীর রাতে নৌকো চলাচল হতে সে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। মাথার কাছে রাখা টোটাভরা বন্দুকটা টেনে নিয়ে শূন্যে কয়েকটা আওয়াজ করল সে।

কান পেতে শুনল অ্যানা নৌকোগুলো দ্রুত দাঁড় টেনে পালাচ্ছে। এতক্ষণে বন্দুকের আওয়াজে কুঠিতে হৈ হৈ পড়ে গেছে। দরোয়ানরা হাঁকতে শুরু করে দিয়েছে। কয়েকজন বরকন্দাজ এলোমেলো ছুটোছুটি করল। ওপরে উঠে এলেন বৃদ্ধ নায়েব। অ্যানা বললে সে নিজেই গুলি চালিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল কারা যেন নৌকো করে এসেছিল, আবার দ্রুত চলে গেল।

কতক্ষণ পরে আবার সব ঝিমিয়ে পড়ল। শীত পড়েছে। পাহাড়ী জায়গায় রাতে বেশ শীত অনুভূত হয়। ঘুমুতে পারল না অ্যানা। জানালা দিয়ে কতক্ষণ সে তাকিয়ে রইল নদীর দিকে। নদী আর নীলকুঠির মাঝে কয়েকটি বড় বড় গাছ। অ্যানার মনে হল কে যেন দাঁড়িয়ে আছে একটি গাছের তলায়। খুব ভাল করে দেখল সে। মনে হল মেয়েমানুষ। মাথায় ঘোমটা রয়েছে। অ্যানা নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। পেছনের দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

ধারণা তার ভুল নয়। অ্যানার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল মেয়েটি। একটি পাতলা শাড়ি তার সর্বাঙ্গে জড়ানো। তাও ভিজে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপটে গিয়েছিল। শীতে কিংবা শঙ্কায় সে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

কে তুমি ?—অ্যানার গলার স্বরে প্রবল বিস্ময়।

মেয়েটি শুধু কাঁপছিল, কথা বলার শক্তিটুকু বোধকরি সে হারিয়ে ফেলেছিল।

কোন ভয় নেই, এসো আমার সঙ্গে। —অ্যানার গলায় অভয়ের স্বর বেজে উঠল। মেয়েটির হাত ধরতেই সে প্রায় মূর্ছিতের মত ঢলে পড়ল অ্যানার ওপর। অনেক কষ্টে অ্যানা তাকে শোবার ঘরে এনে তুলল। মেয়েটি কাঁপছে, আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে।

নিজের হাতে দুধ গরম করে আনল অ্যানা। খাওয়াল মেয়েটিকে নিঃশব্দে অ্যানা করল সব। মেয়েটি তখনও প্রায় মোহগ্রস্ত।

কাপড় ছাড়াতে গিয়ে অ্যানা দেখল মেয়েটির গা-ভরা অলংকার। একটি নিটোল ফুলের মত সুন্দর সেই অপরিচিত মেয়েটি। বিছানায় এনে তাকে শুইয়ে দিল অ্যানা। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল মেয়েটি।

মুখের কাছে বাতি তুলে ধরল অ্যানা। কি সম্ভ্রান্ত মুখশ্রী! নামিয়ে নিল বাতি। কত প্রশ্ন ভিড় কবে এলো মনে। কে এই মেয়ে! কোথা থেকেই বা এলো!

অ্যানা বুঝল, কিছুক্ষণ আগে নদীতে যে নৌকোর আনাগোনা চলেছিল, তার সঙ্গে এই মেয়েটির নিকট কোন যোগাযোগ নিশ্চয়ই রয়েছে।

সংগোপনে চলল সবকিছু। কুঠিব কোন লোকই জানতে পারল না নবাগতা মেয়েটিব কোন খবব। একটি সপ্তাহ কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল। এখন মেয়েটি একটু সুস্থ হয়েছে। প্রথমদিকে সে শুধু কেঁদেই ভাসাত, আজকাল কি যেন ভাবে, তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে। অ্যানা কাছে এসে দাঁড়ালে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। অ্যানা যখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদব করে তখন এই বিদেশিনীকে তার খুবই কাছের মানুষ বলে মনে হয়।

সেদিন বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দুজনে বসে ছিল গোলগম্বুজের ঠিক তলাব ঘরে। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল বহুদূরের জনপদ। বেলাশেষেব আলোটুকু বড় করুণ আর কোমল একটা প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছিল দুজনের মুখে।

অ্যানা বলল, নামটি তোমাব বলবে না ভাই?

মেয়েটি কথা বলল, কি হবে দিদি নাম জেনে! যে মানুষ মরে যায়, তার সঙ্গে নামটিও যে মুছে যায়।

হাসল অ্যানা,—কে বললে ও কথা, তুমি তো আমার পাশে বসে আছ।

পাশে থাকলেই কি বেঁচে আছি বোঝায় দিদি ?—চোখ ছলছলিয়ে উঠল মেয়েটির।

অ্যানা কথার মোড় ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে,—আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে নতুন কোন নামে ডাকি তাহলে আপত্তি করবে কি ?

যেমন করে ডাকলে তুমি খুশী হও তেমনি করে ডেকো আমায়।

অ্যানা বলল, জানো, যখন দেশে ছিলাম তখন খুব ছোট আমি। খেলতাম যার সঙ্গে সে ছিল আমার পাশের বাড়ির একটি মেয়ে। খুব যখন বন্ধুত্ব জমে উঠল তখনই বাবার সঙ্গে চলে আসতে হল এ দেশে। দুজনের সে কি কান্না! আমাদের গাড়ি চলে আসছে আর ও বড় করুণ মুখটি করে তাকিয়ে আছে গাড়িটার দিকে। আজ দেশের আর কিছু মনে নেই, কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে সেই মুখখানা ভেসে ওঠে।

মেয়েটি বলল, কি নাম ওর ?

অ্যানা বলল, মেরা। আচ্ছা, যদি ঐ নামটা তোমারও হয় ?

মেয়েটি মুখ নীচু করল। মাথা নেড়ে জানাল এতে তার অসম্মতির কিছু নেই।

অ্যানা মেয়েটির মুখখানা তুলে ধরে বার বার বলতে লাগল, মেরী, মেরী, আমার মেরী।

অ্যানার উত্তাপে মৃদু হাসির রেখা মুহূর্তের জন্যে দেখা দিল মেয়েটির মুখে। সারাদিনের বর্ষণশেষে মেঘের গায়ে যেমন একটুখানি রোদ্দুর ক্ষণিকের জন্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

আচ্ছা মেরী এবার বল তো দেখি, এতদিন যে তুমি আমার হাতে খেলে, জাত যাবে না তোমার ?

মেয়েটি গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, যেদিন থেকে ঘরের বার হয়েছি, সেদিন থেকে সমাজে আর কোন ঠাঁই নেই আমার। এখন যে নামেই ডাকো, যেমন করেই খাওয়াও কিছু আর আসে যায় না।

অ্যানা বলল, তুমি তো নিজের ইচ্ছায় ঘর ছাড়তে চাওনি বোন,

জোর করে যদি লুঠেরা তোমাকে চুরি করে আনে, তাহলে সে দোষ তো তোমার নয় ?

বড় কঠিন আমাদের সমাজের নিয়ম দিদি। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একবার যা ত্যাগ করা যায়, তাকে আর ফিরে পাবার কোন অধিকারই থাকে না।

অ্যানা গম্ভীর হয়ে বলল, থাক তোমার সমাজ। তুমি আমার বোন, এটাই আজ থেকে তোমার পরিচয়।

মাথাটা ধরে নাড়া দিল অ্যানা মেয়েটির। খুব গম্ভীর হয়ে এরপর কিছুক্ষণ বসে রইল অ্যানা গালে হাত দিয়ে।

অ্যানাকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল, কিছু ভাবছ দিদি ?

একবার ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে অ্যানা আবার ভাবতে লাগল।

ভয় পেয়ে সংকুচিত হয়ে গেল মেয়েটি। অযাচিত এতটা উপকার সে আশা করেনি। সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে সে, শুধু রূপের সম্বল নিয়ে হিরণ্যগড়েব ছোটরানী হতে চলেছিল, কিন্তু পাবার ভাগ্য না থাকলে সবকিছু হাতেব কাছে এসেও যে খসে পড়ে যায়। কে জানত এমন করে তার নিয়তি তাকে পথে এনে দাঁড় করাবে!

কত কথা মেয়েটির মনে ভিড় করে আসছিল, হঠাৎ চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল অ্যানার কথায়। অ্যানা কি যেন আবিষ্কারের আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল,—মেরী, একটা বিষয়ের সমাধান করে ফেলেছি।

তাকাল মেয়েটি তার দিকে।

আমি ক'দিন থেকেই ভাবছি, কি করব তোমাকে নিয়ে। এমন করে তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না বেশীদিন। তুমি যদি বাবার কাছে ফিরে যেতে চাইতে তাহলে আমার দিকের সব ভাবনাই চুকে যেত। কিন্তু তুমিই বলছ, সমাজই বন্ধ করেছে তোমার যাবার পথ। সে যা হোক, এখন তুমি আমার, তাই ভাবনাটাও পড়েছে আমার ওপর, তাই না ?

তেমনি তাকিয়ে রইল মেয়েটি। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ সজল হয়ে এলো।

শোন, এখন আসল মতলবটা বলি, তুমি এবার থেকে হবে আমার নিকট সম্পর্কের এক বোন।

সে তো হয়েই আছি,—মেয়েটি বলল।

না, না, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না, এখন থেকে তুমি আর এ দেশের মেয়েই নও, স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে মেরী তুমি।

তা না হয় হল, কিন্তু কে বিশ্বাস করবে একথা। আমার পোশাক, আমাব চেহারা কি বিদেশীর বলে মনে হচ্ছে ?

তাইতো তোমাকে দেখছিলাম এতক্ষণ। তোমার ঐ রঙে একটু প্রসাধন পড়লেই কেউ আর ভুল করবে না এদেশীয় বলে।

আর শাড়িও কি তোমবা পব নাকি আজকাল ?—মেয়েটি হেসে বলল।

জলদি এসো দেখি, তোমাকে কেমন মানায় আমার পোশাক-গুলোতে তাই দেখব,—হাত ধরে মেয়েটিকে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে চলল অ্যানা।

ঘরে ঢুকে রাশি রাশি পোশাক স্তূপীকৃত করে ফেলল। সে এক একটা তুলে দেখে, পছন্দ হয় না, টান মেরে ফেলে দেয় দূরে। কোনটা একটু পছন্দ হলে তাকিয়ে দেখে নবাগতার দিকে। মনে মনে মিলিয়ে নেয়। মাথা দুলিয়ে ফেলে দেয় সেটা। কোনরকমেই যেন দামী দামী পোশাকগুলো অ্যানার মনেব সঙ্গে মিল রেখে সুন্দর হয়ে উঠতে পারছে না আজ।

পছন্দ হল একটি। দিল্লীতে বেড়াতে গিয়ে জন্মদিনে বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিল এই উপহার।

নিপুণ হাতে মেয়েটিকে সাজাল সেই পোশাকে। প্রসাধন শেষ করে বার বার চেয়ে দেখল তার দিকে। তারপর ওকে সামনের বিরাট আয়নাখানার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, দেখ তো এবার চিনতে পার কি না নিজেকে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার বড় বড় চোখ দুটো। এ কাকে দেখছে সে! কে এই নবাগতা বিদেশিনী! এ তবে কি তার নবজন্ম হল! সে কি আর মৈত্রেয়ী নয়! কে তাকে দেখে এখন বলবে পণ্ডিত রামকান্ত-ভট্টাচার্যের মেয়ে সে! মেরী, মেরী, মৈত্রেয়ী মরে গিয়ে আজ মেরী হয়েই জন্মেছে।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যানা। চোখেমুখে তার সফলতার হাসি উপচে পড়ছে।

ফিরে তাকাল 'মেরী' তার দিকে। মুখের হাসি সেও আর লুকোতে পারল না এবার।

অ্যানা বলল, তোমার ঐ কালো কালো চোখ দুটোকে আর ঢাকা গেল না কিছুতেই। থাক, ওটুকু ঢাকা পড়লে আমারই কষ্ট হবে তোমাকে চিনতে।

বিয়ের বাসরেব দামী শাড়িখানা যত্নে তুলে রাখল অ্যানা আলমারিতে।

পরদিন ভোর না হতেই একটি ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে গেল ওডেন সাহেবের কুঠি থেকে। সবাই জানল মেমসাব শহরে যাচ্ছেন তাঁর কোন এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াকে কুঠিতে নিয়ে আসবার জন্যে।

সন্ধ্যের মুখোমুখি গাড়ি যখন ফিরল, সেপাই, নায়েব, গোমস্তারা সেলাম দিয়ে দাঁড়াল কুঠিবাড়ির সামনে। মেরীর হাত ধরে গাড়ি থেকে নামল অ্যানা। হাসতে হাসতে দু'বোন হাত নাড়তে নাড়তে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে ঢুকে গেল কুঠিবাড়ির অন্দরমহলে।

নীলকুঠির জীবনে এ এক অভাবিত ঘটনা। নিঃসঙ্গ অ্যানার জীবনে এলো এক সঙ্গিনী। গভীর দুঃখের ভেতর দিয়ে যে তার কাছে আজ ঈশ্বরের দান হয়ে এলো তাকে সে বরণ করে নিল পরম আদরে।

এমনি করে কেটে গেল দুটি বছর। মৈত্রেয়ীর জীবন থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল গ্লানি। অ্যানা আজ তার জীবনকে ভরে দিয়েছে নতুন নতুন ঐশ্বর্যে।

শুধু যখন দিনান্তের কোলে ছায়া ঘনায় তখন কেন জানি না মৈত্রেয়ী উঠে আসে ছাদের ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেখানে নক্ষত্রের ফুল ফুটেছে সেখানে সে তার দুটি চোখের তারাকে পাঠিয়ে দেয়। অন্ধ বাবা এ সময় দাওয়ার ওপর বসে স্মৃতি মন্থন করে মৈত্রেয়ীকে নক্ষত্রের অবস্থান আর নাম শেখাতেন। বশিষ্ঠ, অরুন্ধতীর গল্প বলতেন। কত আগ্রহে আর তৃপ্তিতে কেটে যেত তার এই সন্ধ্যেবেলা।

অ্যানার মত শৈশবেই মৈত্রেয়ী হারিয়েছিল তার মাকে। অন্ধ বাবার সেবা করে কাটত তার দিন। এক বিধবা পিসি থাকত তাদের কাছে। সংসারে মানুষ বলতে তারা ছিল এই তিনজনই।

দরিদ্র ছিল তারা। কিন্তু সেই দারিদ্র্যের পাঁকে সে জন্মেছিল পদ্মিনীর রূপ নিয়ে। তার রূপের খবর তাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরি লাগেনি।

হিরণ্যগড়ের ছোটকুমার বাহাদুর যেদিন তাকে দেখতে এলেন, সেদিনটি তার কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাবা শিষ্য বাড়ি থেকে ফিরে এলেন সকাল সকাল। রোজকার মত সে চৌকি পেতে দিল বাবার বিশ্রামের। জল ঢেলে ধুইয়ে দিল পা।

বাবা এবার উঠে এসে বসলেন দাওয়ার ওপর পাতা মাদুরে। পোঁটলাটি নিজের হাতে খুলতে খুলতে বললেন, মা, আজ তোর জন্যে কি এনেছি দেখ মা।

একটি হলুদ শাড়ি কিনে এনেছেন বাবা। টুকটুকে রাঙা পাড়।

বললেন, পরে আয় তো মা আমার কাছে।

মৈত্রেয়ী শাড়িখানা পরে এসে বাবাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

রামকান্ত বললেন, কাছে আয় মা একবার।

চিবুকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। দুটি অন্ধ চোখ বিস্ফারিত করে কতক্ষণ মেলে রইলেন তার দিকে।

বুক ভরে গেল মা! হলুদরঙের শাড়ি, লাল পাড়ে কি সুন্দর

মানিয়েছে আমার মাকে! লক্ষ্মী হয়ে নারায়ণের ঘর আলো কর মা।

রামকান্ত যেন সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, এমনি ভাব করে কতক্ষণ তৃপ্তিভরে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠল তাঁর চোখ। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ধারা।

নতুন কাপড়ে মুছিয়ে দিল মৈত্রেয়ী বাবার চোখের জল। তার নিজের চোখেব ধারাও বাধ মানল না।

সেদিন অপরাহ্নে কনে-দেখা-আলোয় সারা আঙিনা ভরে গেছে। ঘট ভরে জল আনছিল মৈত্রেয়ী ঘরে।

বাবার ডাক শোনা গেল—মা, আমার কাছে এসো তো একবার।

খিড়কি দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল মৈত্রেয়ী, সদরে চলে এলো।

এসেই চমকে উঠল সে। উঠোনে একটি সাদা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। দাওয়াব ওপর বাবার পাশটিতে বসে রয়েছেন বলিষ্ঠ সুন্দর একটি পুরুষ।

মৈত্রেয়ীর পায়ের সাড়া পেয়ে বাবা বললেন, প্রণাম কর মা, হিরণ্যগড়ের কুমার বাহাদুর এসেছেন।

প্রণাম করল সে আগন্তুককে। মুখ তুলতেই আগন্তুক রামকান্তকে বললেন, যদি অনুমতি করেন তাহলে আমাদের বংশের আশীর্বাদপূত হীরের আংটি পরিয়ে দিয়ে যাই।

বিস্ময়ে কাঁপছিল মৈত্রেয়ী। রামকান্ত বললেন, যদি মা আমার হিরণ্যগড়ের বধূ হয়ে যাবার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মে থাকে তাহলে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

আজও মাঝে মাঝে মৈত্রেয়ী তার হাতের আংটির দিকে তাকায়। রাতে ঐ আংটির হীরকখণ্ডটি জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে। মৈত্রেয়ী ভাবে, এ কি ঘটে গেল তার জীবনে। যে আংটি আজ তার হাতে শোভা পাচ্ছে সে যে রায়বংশের অচলা সম্পদ।

এই হীরক অঙ্গুরীয় মিথ্যা হবার নয় বলেই সে আবাল্য গল্প শুনে এসেছে। এই হীরেই আনে লক্ষ্মীর সম্পদ। কিন্তু একি হল! তার অশুভ স্পর্শে সবই যে মিথ্যে হয়ে গেল!

এক সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখছিল মৈত্রেয়ী, পাশে এসে দাঁড়াল অ্যানা।

রোজ রোজ তুমি একা একা ছাদে এসে কি দেখ মেরী?

আকাশের তারা।

সে তো একদিন দেখলেই ফুরিয়ে যায়, নিশ্চয়ই তুমি আর কিছু কর।

আমার বাবার কথা মনে পড়ে এ সময়ে।

কতক্ষণ কি ভাবল অ্যানা। একসময় বলল, আচ্ছা মেরী, ইচ্ছে করে না তোমার বাবার কাছে ফিরে যেতে?

বলেইছি তো ভাই, সে পথ আমার বন্ধ। ইচ্ছে করলেও যে আর ফিরে যেতে পারি না!

আচ্ছা, তুমি না বলেছিলে তোমার বাবা অধ্যাপনা করেন।

হ্যাঁ, পাশের গাঁয়ের টোলে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পড়ান।

আমি যদি সংস্কৃত শিখতে চাই, তোমার বাবা কি পড়াবেন?

গম্ভীর হয়ে এলো মৈত্রেয়ীর মুখখানা।

তোমাকে কি আঘাত করলাম মেরী?—অ্যানার গলায় বিস্ময়ের সুর।

ঝরঝর করে ঝরে পড়ল মৈত্রেয়ীর চোখের জল।

অনেক দয়া করেছ দিদি, আর আমি সইতে পারছি না। বাবাকে দেখলে কিছুতেই স্থির থাকতে পারব না আমি।

আমি না তোমার দিদি, মেরী? তোমার বাবার ওপর আমার কি কোন অধিকার নেই?

অ্যানাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল মৈত্রেয়ী।

পরের দিন নায়েবকে পাঠাল অ্যানা রামকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি। বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলে দিল।

যদি তিনি সম্মত হন, পালকি যাবে সপ্তাহে দুটি দিন তাঁকে কুঠিতে নিয়ে আসতে। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তিনি। অ্যানা তাঁর সংস্কারে কোনদিনই বাধা দেবে না।

অনেক কথা বলেই অ্যানা পাঠাল নায়েবমশায়কে। ফিরে এলেন নায়েব শুভ সংবাদ নিয়ে। রাজী হয়েছেন রামকান্ত কুঠিতে এসে মেমসাহেবকে পড়াতে।

সপ্তাহে দুটি দিন পালকি যায় নয়াবসান গ্রামে। অন্ধ রামকান্ত আসেন হেপ্‌বার্নের নীলকুঠিতে।

শুরু হয় পাঠ। সংস্কৃতের আক্ষরিক শিক্ষা নয়, কাব্য সাহিত্যের পাঠ আর ব্যাখ্যা।

আকাশে মেঘডম্বর শোনা গেলে রামকান্ত কান পেতে শোনেন সে ধ্বনি। জলদগম্ভীর কণ্ঠে মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা আবৃত্তি করে যান!

হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেন, দেখেছ মা, কত ফুল ফোটে বর্ষায়?

যেন রামকান্ত সবই দেখছেন। শুধু দেখা নয় আঘ্রাণ পাচ্ছেন যেন তিনি।— জানো মা, কালিদাসের কাব্যে ফুলের মেলা। রাশি রাশি পুষ্পে যেন পূজা করেছেন কাব্যলক্ষ্মীকে।

কুমারসম্ভব পাঠ চলছিল সেদিন। শিবের জন্যে ভিক্ষে করতে এসেছেন ঋষিরা উমাকে। পিতা হিমালয় পূর্ণ করছেন তাঁদের প্রার্থনা।

থেমে গিয়ে বলেন রামকান্ত, কন্যাকে প্রার্থনা করতে হয় মা, সে যে শ্রী, সে যে শক্তি।

এদিকে মেনকা গৌরীকে সাজাচ্ছেন। মায়ের দৃষ্টি আকুলিত। আজ নিকটকে দূর করবার ডাক এসেছে। মায়ের প্রাণে তাই দুঃখের ঢেউ উঠেছে। মঙ্গলসূত্র বাঁধতে হবে হাতে, কিন্তু কোথায় বাঁধেন মেনকা। চোখের জলে সবই যে তাঁর ঝাপসা হয়ে এসেছে।

ববন্ধ চাস্রাকুলদৃষ্টিরস্যাঃ
স্থানান্তরে কল্পিতসন্নিবেশম্।
ধাত্র্যঙ্গুলীভিঃ প্রতিসার্যমাণ-
মূর্ণাময়ং কৌতুকহস্তসূত্রম্॥

ভাঙা ভাঙা গলায় শ্লোকের আবৃত্তি করলেন পণ্ডিত রামকান্ত। যেন বুকটা তাঁর এইমাত্র শতধা হয়ে ভেঙে গেল। নীরব হলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না নিজের হৃদয়াবেগকে ঢেকে রাখতে। অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর চোখের জল।

বাবা!—কান্নায় ভেঙে পড়ল মৈত্রেয়ী।

কে! কে আমায় এমন করে ডাকলে!

হতবাক হয়ে গেছে অ্যানা। মৈত্রেয়ীকে মুহূর্তে সে সরিয়ে নিয়ে গেল সেখান থেকে কক্ষান্তরে। ফিরে এলো যখন তখন কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন পণ্ডিত রামকান্ত। একটু লজ্জিতও হয়েছেন বলে মনে হল।

বললেন, একান্ত ব্যক্তিগত কোন দুঃখের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল মা, তাই নিজেকে আর স্থির রাখতে পারিনি। কিন্তু আমি যেন স্পষ্টই শুনলাম হতভাগিনী মেয়েটা আমাকে বাবা বলে ডাকল।

এ আপনার মনের ভ্রমও তো হতে পারে পণ্ডিতমশায়!

কিছুক্ষণ করুণ মুখে কি যেন ভাবলেন পণ্ডিত রামকান্ত। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাই হবে মা। মৈত্রেয়ী অনেকদিন হল পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে।

অ্যানা বলল, একটু বিশ্রাম করুন পণ্ডিতমশায়, আমি আসছি এখুনি।

চলে এলো অ্যানা মৈত্রেয়ীর ঘরে। বলল, তুমি না আমায় কথা দিয়েছিলে মেরী, কোনদিন ভেঙে পড়বে না বাবার কাছে!—অ্যানার গলায় অনুযোগের সুর।

শাস্তি দাও দিদি, নিজেকে বেঁধে রাখতে পারিনি।

জলে ভরা দুটো চোখ মেলে মৈত্রেয়ী তাকিয়ে রইল অ্যানার দিকে।

অ্যানা এবার দু'হাতে মুখটি তুলে নাড়া দিল মৈত্রেয়ীর। সমস্ত গম্ভীর পরিবেশটাকে মুহূর্তে সে লঘু করে দিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেল। মৈত্রেয়ী তাকিয়ে রইল তার দিকে।

আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, একটা কথা বলবেন আমাকে ?

কি মা ?

আগে বলুন, কোন কথা গোপন করবেন না আমার কাছে।

মা বলে যাকে ডেকেছি, সে যে দেশীয়ই হোক না কেন তার কাছে গোপনতার কিছু নেই।

আপনি কার দুঃখে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, জানতে ইচ্ছে করে।

তোমারই মত সে আমার একটি মেয়ে মা।

কি হয়েছে তার ?

সে অনেক কথা মা, রামকান্ত বললেন, তবে সংক্ষেপে বলি,—বধূ হতে গিয়েছিল সে হিরণ্যগড়ের, কিন্তু বিয়ের রাতেই দরিদ্রের ঘর থেকে মেয়েটিকে ডাকাতি করে নিয়ে যায় লুঠেরা।

বাধা দিতে পারেনি কেউ ?—অ্যানা প্রশ্ন করে।

সারা গাঁয়ে এমন শক্তিমান কেউ ছিল না মা। তবে ছোটকুমার লড়েছিলেন প্রাণপণ। কপালে তাঁর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাকি রয়েছে সেই থেকে।

মেয়েটির কি হল জানতে পেরেছেন কি ?

লোকমুখে শোনা যায় সে নাকি সুবর্ণরেখার জলে ঝাঁপ দিয়ে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

তার মানে আপনার কন্যা আত্মঘাতিনী হয়েছেন ?

অসম্মানের চেয়ে মরণ যে ভাল মা।

কিন্তু পণ্ডিতমশায়, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটি প্রশ্ন করব আপনাকে।

পণ্ডিত রামকান্ত অ্যানার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যে মেয়েটিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে নিয়ে যাওয়া হল, সে যদি ফিরে আসে কোনরকমে, নেবেন কি তাকে ঘরে ফিরিয়ে ?

কি যেন ভাবলেন রামকান্ত। ধীরে ধীরে বললেন, আমাদের সকল কিছু ক্রিয়াকর্ম সমাজের নির্দেশে বাঁধা মা। সেখানে নিজের ইচ্ছে বলে কোন কিছু নেই। আমার প্রাণ চাইলেও সমাজ তাকে নিতে চাইবে না।

সমাজ চায় না বলে আপনি আপনার নিজের মেয়েকে পেয়েও হারাবেন ?

আজ যদি আমার মেয়ে ফিরে আসে আমার কাছে তাহলে আমাদের দুজনকেই না খেতে পেয়ে মরতে হবে। সমাজের শত্রুতায় ক'দিন টিকে থাকা যায়।

ধন্য সমাজের বাঁধন আপনাদের!—অ্যানার গলায় ক্ষোভের সুর বেজে উঠল।

রামকান্ত বললেন, সমাজের গঠনে খারাপ ভাল সব উপাদানই আছে মা। শুনেছি, তোমাদের সমাজে পরস্পরকে সাহায্য করার চেয়ে নিজের নিজের উন্নতিটাকেই বড় করে দেখে সকলে। কিন্তু আমাদের সমাজে সহযোগিতার একটা আন্তরিক মনোভাব আছে। পরস্পরের সুখে দুঃখে একত্রে থাকা; কোন অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীর জন্য প্রাণ দিয়ে কাজ করা, এ সব সমাজের শুভ দিক মা। তবে আবর্জনা যা জমেছে তা কলুষিত করছে সমস্ত সমাজ।

অ্যানা আর কোন কথা বাড়াতে চাইল না। সেদিনের মত পড়ার আসর ঐখানেই শেষ হল।

প্রতিদিন গোলমালের খবর আসছে চারিদিক থেকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নীলকর সাহেবদের যে সব কুঠি রয়েছে সেগুলি এক একটি নরকবিশেষ। খুন, রাহাজানি, গৃহদাহ লেগেই আছে। দাঙ্গার খবরও পাওয়া যাচ্ছে জায়গায় জায়গায়। কোন কোন অঞ্চলের প্রজা মরিয়া হয়ে নীল চাষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

যেখানে নীলকর প্রবল সেখানে সেপাই পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মানুষগুলোকে কুঠিতে। কয়েদ করে রাখা হচ্ছে তাদের। চামড়ায় বাঁধানো বেত শ্যামচাঁদ। তাই দিয়ে নির্মমভাবে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেওয়া হচ্ছে মানুষগুলোর দেহে।

যারা একটু বেপরোয়া তাদের হচ্ছে চরম দণ্ড। মরে নীলের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে তারা। সরকার বসিয়েছেন বিচারক। নীলের মামলার বিচার করবে তারা। কিন্তু নীলকর আর বিচারক প্রায় সবাই এক জাতির। তাই বিচার চলেছে একতরফা। জমি নিয়ে দাঙ্গা লাগছে কখনো কখনো নীলকুঠির মালিক আর এদেশীয় জমিদারের সঙ্গে। সে এক ভয়াবহ লড়াই। দুজনেই শক্তিমান, সমানে সমানে যুদ্ধ। সহজে হার মানতে চায় না কেউ। ভেতরে ভেতরে চলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার লড়াই।

মনে মনে ভাবে অ্যানা, ভালই হল। মানুষের শেষ সহ্যের বাঁধটুকু যখন ভাঙে তখন সে মরিয়া হয়ে ফিরে মার দেয়। এতদিনের অত্যাচারের ঋণ তাদের জাতকে এবার ফিরিয়ে দিতে হবে কড়ায়গণ্ডায়।

ওডেন সাহেব অবস্থা ফিরিয়েছেন নীল চাষে, কিন্তু প্রথম প্রথম নিজের জমিতেই চাষ করিয়েছেন জনমজুর এনে। দাদন দিয়ে মিথ্যার জালে জড়াতে চাননি মানুষগুলোকে। এতে রাতারাতি ভাগ্য ফেরান সম্ভব হয়নি তাঁর, কিন্তু মনের শান্তিতেই তিনি ব্যাবসা করে গেছেন। আর তাঁর সততার পথ বেয়ে লক্ষ্মীও এসেছেন সোনার ঝাঁপি হাতে নিয়ে। এ তল্লাটের প্রজারা সুখে দুঃখে ওডেন সাহেবের দ্বারস্থ হয়েছে। সাহেব সাধ্যমত তাদের সাহায্য করেছেন, বুদ্ধি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, কখনো স্থান দিয়ে।

অ্যানা বাইরে একটু কঠিন কিন্তু মনে মনে সে নিজেকে এই অসহায় মানুষগুলোর একজন বলেই ভাবে। প্রজারা তাদের এই নতুন মনিবটিকে চিনতে একটুও ভুল করেনি।

হেপবার্ন পরিবারের এই ভালমানুষিকে সুনজরে দেখতে পারেনি

আশপাশের নীলকর সমাজ। প্রজারা তাড়া খেলেই চলে আসত দলে দলে হেপবার্নদের আশ্রয়ে। উৎখাত প্রজারা ওডেন সাহেবের এলাকায় ঘর বেঁধে থাকারও সুযোগ পেত।

হিরণ্যগড়ের জমিদারেরা যেদিন থেকে নীল চাষের পত্তন করল সেদিন থেকে ওডেন সাহেবের কুঠির সঙ্গে তাদের একটা গোপন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আর তাছাড়া ওডেন যখন সব ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন তখন রাজা দুর্লভ রায় অ্যানা হেপবার্নকে শায়েস্তা করার একটা সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। দুর্লভ রায় কিছুতেই ভুলতে পারলেন না যে তাঁরই জমিদারির এক অংশ কিনে নিয়ে হেপবার্নরা আজ রাজা হয়ে বসেছে।

এদিকে নীলকরদের অত্যাচার যত বাড়তে লাগল প্রজাদের অসন্তোষ তত বেশী ধূমায়িত হতে লাগল। বিচারালয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজারা হেপবার্নদের সততার উদাহরণ উপস্থিত করে অন্য নীলকরদের আজকাল হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে।

সুযোগসন্ধানী দুর্লভ রায়ের সুযোগ এসে গেল। তিনি অক্লান্তভাবে তদ্‌বির তদারক করে ফার্গুসন সাহেবের বাংলোতে এক আলোচনা সভা ডাকার ব্যবস্থা করলেন।

নীলকরদের স্বার্থেই ডাকা হল সেই সভা। বর্তমান নীল চাষের সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করা হবে সেই সভাতে।

অ্যানা গেল সেই সভায়। অনেক তর্কবিতর্ক, বিভিন্ন পথের সন্ধান চলল, কিন্তু সমাধান কিছুই হল না।

দুর্লভ রায় কিছু পরিমাণে সফল হলেন অ্যানা হেপবার্নকে নীলকর সমাজের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় প্রতিপন্ন করতে। কিন্তু সম্পূর্ণ ইচ্ছাটা তাঁর তখন আর পূরণ হল না।

এই সূত্রে মাঝে মাঝে বিভিন্ন নীলকুঠিতে সভা চলতে লাগল।

একদিন এমনি এক সভার আয়োজন করতে হল অ্যানাকেও।

বিভিন্ন কুঠি থেকে এলেন নীলকর সাহেবরা। অসুস্থতার অজুহাতে এলেন না রাজা দুর্লভ রায়।

খানাপিনা চলল বহু রাত অবধি। অ্যানার ইঙ্গিতে মৈত্রেয়ী অনুপস্থিত রইল এ আসরে। সাহেবরা তখন বাইরে যাবার জন্যে উঠেছেন, এমন সময় অ্যানার স্টাডি থেকে ভৃত্যদের কলরব শোনা গেল। থমকে দাঁড়ালেন নীলকর সাহেবরা। বারান্দা থেকে দেখা যায় স্টাডির ভেতরের সবকিছুই। অন্ধকার ঘরখানা ততক্ষণে আলোকিত হয়েছে। সবাই দেখলেন একটি মহিলা মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

ফলমন সাহেব এঁদের মধ্যে একটু বেশী কৌতূহলী। আর তাছাড়া এই হেপবার্ন পরিবারের কাছে ফলমন অপরিচিত নয়। প্রথমে ওডেন সাহেবের নীলকুঠিতেই ম্যানেজারের কাজ পেয়েছিল সে। কয়েক বছর কাজ করার পর নিজেই নতুন কুঠির পত্তন করে উঠে গেছে কিছুদূরে। লোকে বলে ওডেন সাহেব যত টাকা দিয়েছিলেন, তার চেয়েও অনেক বেশী টাকা প্রজাদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে সরিয়েছে ফলমন। লোকটার একটা হাত কাটা পড়েছিল কোন এক দলাদলির ব্যাপারে। হাতখানা হারিয়ে সে নাকি আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। স্বভাব-চরিত্রের সুনাম ছিল না ফলমন সাহেবের কোনকালেও।

ফলমন ঢুকে গেল অ্যানার স্টাডিতে। ততক্ষণে মৈত্রেয়ী একটু সুস্থ হয়েছে, তাকে বসান হয়েছে একটি চেয়ারে। ফলমন মুহূর্তে দেখে নিল একটি মুখ, যে মুখ শত পোশাক আর প্রসাধনের পারিপাট্যে ঢাকা পড়েনি। শকুনের মত সন্ধানী দৃষ্টির কাছে কিছুই আর গোপন রইল না। ফলমনকে মৈত্রেয়ীর দিকে তাকাতে দেখেই অ্যানা কপট ঝংকারে ধাক্কা দিল দাসীকে। আলো ধরে ছিল সে। হাত থেকে খসে পড়ল তার আলো। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল কাচ-গুলো। মুহূর্তে ঘরখানা নিরন্ধ্র অন্ধকারে ডুবে গেল।

জ্বলে উঠল এক টুকরো আলো। সেই অন্ধকারের বুকে সাদা দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল মৈত্রেয়ীর আঙুলের হীরের আংটিখানা।

হঠাৎ অট্টহাসিতে কাঁপতে লাগল ওডেনের নীলকুঠি। ফলমন হাসছে। অ্যানার মত শক্ত মেয়েও সেই হাসি শুনে কেঁপে উঠল।

অন্ধকারেই অ্যানাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ফলমন বেরিয়ে আসতে গিয়ে বলল, অশেষ কৃপা তোমার মিস হেপবার্ন।

অতিথিরা চলে গেলে একান্তে মৈত্রেয়ীকে ডেকে এনে অ্যানা ধমকের স্বরে বলল, কি করলে বল তো আজ তুমি! নিজেও ডুবলে আর আমাকেও তোমার সঙ্গে টেনে এনে ডোবালে!

চুপ করে রইল মৈত্রেয়ী।

ওকে নীরব থাকতে দেখে অ্যানার রাগ আরও চড়ে গেল, নিজের সীমা তুমি ছাড়িয়ে যাচ্ছ মেরী। কি দরকার ছিল তোমার স্টাডিতে ঢুকে সবকিছু লক্ষ্য করার?

এবার গলার স্বর একটু নামিয়ে বলতে লাগল অ্যানা, ফলমনকে তুমি চেন না, এমন কাজ নেই যা ও করতে পারে না।

এতক্ষণে মুখ খুলল মৈত্রেয়ী। ভয়ে, লজ্জায়, দুঃখে সে যেন এতটুকু হয়ে গেছে—আমি ঐ মানুষটাকেই ছাদের ওপর থেকে একবার দেখতে পেয়েছিলাম দিদি। ঠিক সেই লোকটি কি না মিলিয়ে নেবার জন্যে অন্ধকারে তোমার স্টাডিতে ঢুকেছিলাম।

তুমি কার কথা বলছ মেরী, ফলমনকে তুমি চিনলেই বা কেমন করে?

এই মানুষটাই যে আমার কালগ্রহ দিদি। আমি ঠিকই দেখেছি, যখন বাসরঘরে ছোটকুমারের সঙ্গে কাটছিল আমার রাত, ক্লান্তিতে তন্দ্রা এসেছিল ওঁর, তখন ঘোড়ার খুরেব শব্দ পেয়েছিলাম আমি বাড়ির ঠিক পেছন দিকে।

যতটুকু চাঁদের আলো পড়েছিল, তাতেই দেখলাম ঐ ছায়ামূর্তিকে। বাঁ হাতখানাতে উঁচিয়ে ধরে আছে একখানা তলোয়ার।

তারপর বিকট চীৎকার শুরু হয়ে গেল। যে কটা আলো তখনও জ্বলছিল, তলোয়ারেব খোঁচায় নিভে গেল সব। আমি ঠিক আজকের মতই ভয়ে মূর্ছা গেলাম।

যখন চেতনা এলো তখন দেখি একখানা পালকিতে করে গভীর শালবনের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে চলেছি আমি।

নদীর কাছে ছিল নৌকো বাঁধা, পালকি সমেত আমাকে তোলা হল একটা নৌকোর ওপর। পালকির ভেতরের ফাঁকটুকু দিয়ে দেখলাম, ঘোড়ায় চেপে ঐ মানুষটাই তীরে দাঁড়িয়ে আকারে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিচ্ছে দলের লোকদের।

প্রাণভয়ে আমি পালকি থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। তার পরের ঘটনা তোমার অজানা নয় দিদি।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অ্যানা। ফলমন ডান হাত হারিয়ে বাঁ হাতেই বন্দুক আর তলোয়ার চালায়। এই বাঁ হাতের নিশানা তার প্রায় অব্যর্থ।

মৈত্রেয়ীকে উৎসাহ দিয়ে অ্যানা বলল, ভয় পেও না, এখন থেকে অনেক সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। যে নেকড়ে একবার রক্তের স্বাদ পায়, সে গন্ধ শুঁকে আবার ফিরে আসে তার শিকারের কাছে।

সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল মৈত্রেয়ী। এই মানুষটা যে আবার কোনদিন তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে তা সে বুঝি কল্পনাও করতে পারত না।

মৈত্রেয়ী একসময় বলল, তোমার এখানে ঐ লোকটা এলোই বা কি করে দিদি?

অ্যানা বলল, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ফলমন আগে করত আমাদের কুঠির কাজ, এখন সে নিজেই কুঠিয়াল হয়েছে। তাই নীলকররা যেখানেই জড়ো হবে, সেখানেই অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও ডাকতে হবে ওকে।

মৈত্রেয়ী এবার যেন স্বগতোক্তি করে চলল, লোকটা এত ভীষণ হল কি করে ভেবে পাই না। নীলকর সাহেবরা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে, তার একটা কারণ মোটামুটি বোঝা যায়, কিন্তু এমন লুটেরার মত ব্যবহার শিখল কি করে ঐ সাহেবটা? ওর কাজ-কারবার দেখলে মনে হয়, ও ঠ্যাঙাড়েদের এক জাত।

অ্যানা কিছুক্ষণ মৈত্রেয়ীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, বড় অদ্ভুত কথা তুমি বলেছ মেরী। ফলমন সত্যিকারের জাত ঠ্যাঙাড়ে।

অ্যানা একটু থেমে আবার বলল, আজ বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে মেরী। চল আমরা খোলা ছাদে বিশ্রাম করিগে। সেখানেই আমি তোমাকে ঐ অদ্ভুত বিকৃত মানুষটার কাহিনী বলব।

ওরা এসে বসল কুঠির ছাদের ওপর। চাঁদের আলোর যেন বান ডেকেছে। ছাদের উঁচু আলসের ভেতরের ফাঁকগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সুবর্ণরেখার জলপ্রবাহ। ওপরের ঝিকিমিকি বালুর চর যেন কোন অমর্তলোকের পরীদের নাচের সোনালী গালিচা বলে মনে হচ্ছিল। আরও দূরে যেখানে চাঁদের আলো শালবনের অন্ধকারের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে মনে হচ্ছিল কারা যেন প্রতীক্ষা করছে। চাঁদ ডুবলেই তারা অভিযান চালাবে। এর পর পাহাড়। অস্পষ্ট ধূসর অতিকায় জন্তুর মত রাতের অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অ্যানা বলল, বড় ভীতু তুমি মেরী, তাই ভয়ঙ্কর কোনকিছু শোনাতে ইচ্ছে করে না তোমাকে।

মৈত্রেয়ী হেসে বলল, তোমার মত দস্যি মেয়ে আমি হতে পারিনি ঠিক, সেজন্যে আমাকে অপরাধী ক'রো না কিন্তু। সাধারণ বামুনের ঘরের মেয়ে আমি। পুজোর ফুল তুলতেই শিখেছিলাম শুধু। আমার কাছে এর বেশী তুমি কি আশা করতে পার বল?

তা ঠিক, বলল অ্যানা, তাই বুঝি তোমার ভগবান তোমাকে দুঃখের ভেতর ফেলে গড়ে পিটে তৈরী করে নেবার চেষ্টা করেছেন?

মৈত্রেয়ী বলল, আমার ভগবান বড় বেশী করুণাময়, তার প্রমাণ তুমি নিজেই। আজ প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্যে কোথায় যে ভেসে যেতে হত তার ঠিক ঠিকানাই নেই!

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অ্যানার দিকে তাকিয়ে রইল মৈত্রেয়ী।

. একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল অ্যানার মুখে। বলল, ভাগ্যের দেবতা আড়ালে থেকে কাকে যে কখন কার সঙ্গে যুক্ত আর কার থেকে বিযুক্ত করে দেন তা বলা খুবই শক্ত মৈত্রেয়ী। হয়তো ফলমনই আজ এই রাতে আমাদের এই কুঠির ছাদে, যেখানে তুমি বসে আছ সেখানে বসে থাকতে পারত আমার পাশে।

মৈত্রেয়ী বলল, এটা নিছক তোমার কল্পনা দিদি।

কল্পনা নয় মেরী। হয়ত তাই ঘটে যেত এতদিনে। ফলমন যে কি চরিত্রের মানুষ তা আমি ছাড়া বুঝি আর কেউ এমন করে জানে না।

মৈত্রেয়ী একটা কোন অশ্রুত কাহিনী শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল।

অ্যানা বলল, ঐ যে দূরের অস্পষ্ট পাহাড়গুলো দেখছ, একদিন ঐ দিক থেকে একটা ঘোড় সওয়ারকে ছুটে আসতে দেখেছিলাম। তখন কালটা ছিল প্রচণ্ড গরমের, আর সময় ঠিক বেলা দুপুর। গনগনে আগুন যেন গলে পড়ছিল চারদিকে। ঐ যে সুবর্ণরেখার চরটা দেখছ, কত স্নিগ্ধ, সেদিন ওখানে যেন ধিক্ ধিক্ আগুন জ্বলছিল।

আমিই প্রথমে জানালা দিয়ে দেখেছিলাম লোকটাকে। নদীর ধারে এসে ঘোড়া নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জলে। কতক্ষণ নদীতে গা ডুবিয়েই রয়ে গেল। ঘোড়াটা চোঁ চোঁ করে জল খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল নদীর চরে। আমার যেন কেমন মনে হল, লোকটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েনি তো! নীচে নেমে এলাম তর্ তর্ করে। বাবা বিশেষ কাজে গিয়েছিলেন কোম্পানীর আফিসে। নায়েবমশায় ছিলেন কুঠিতে। তাঁকে সব কথা বললাম। তিনি হাঁকডাক করে লোকজন জড়ো করলেন। সবাই মিলে কুঠির ঘাটে বাঁধা আমাদের নৌকো করে ওপারে গিয়ে লোকটাকে নদীর জল থেকে তুলে নিয়ে এলো।

এপারে এলে দেখা গেল লোকটা এ দেশীয় নয়, আমাদেরই মত বিদেশী। একটা হাত কাটা পড়েছে। তখনও রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার পোশাক পরিচ্ছদ। সম্পূর্ণ চৈতন্যহীন অবস্থা, তার মুখে চোখে

একটা যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। লোকটা অসহায়ের মত এলিয়ে আছে।

আমাদের নীলকুঠির সর্দার গোলক মুর্মুর বুড়ো বাবা তখন বেঁচে। আশ্চর্য সব দেশীয় গাছ গাছড়ার ওষুধ জানত লোকটি। তাকে ডেকে পাঠান হল। তুমি শুনলে অবাক হবে, তোমাদেরই দেশের ঐ আদিবাসী মানুষটার ওষুধেই কাজ হল। মাসখানেক পরে ফলমন সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাবা লোকটির সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ তার কথাবার্তা, চালচলনে। একটি কথা শুধু তার কাছ থেকে কোনরকমেই জানা গেল না যে কারা তাকে আঘাত করেছিল এবং কেনই বা করেছিল।

বাবা তরুণ ফলমনকে আমাদের নীলকুঠির পদস্থ কর্মচারীর কাজে বহাল করলেন। অচিরে ফলমন তার যোগ্যতার পরিচয় দিতে লাগল। আমাদের কুঠির আয় দিনের পর দিন বেড়ে চলল। শেষ পর্যন্ত বাবা ঐ লোকটাকে কয়েক বছরের ভেতর ম্যানেজারের পদ পর্যন্ত দিয়ে দিতে ইতস্তত করলেন না।

ম্যানেজার হবার দু-একবছর পরে ফলমন হয়ে গেল অন্য মানুষ। বাবার হাত থেকে ধীরে ধীরে যেন যাদুমন্ত্রে প্রায় সব ক্ষমতাই সে হস্তগত করে নিলে। ঐ সময় আমাদের এ বাড়ীতে এক ভদ্রমহিলার আসা যাওয়া চলছিল। বাবা তাঁকে নিয়ে প্রায়ই এদিক ওদিক বেড়িয়ে বেড়াতেন। কুঠির কাজকর্মের ভেতরে তিনি নিজেকে আর বেশী করে জড়িয়ে ফেলতে চাইতেন না। ফলমন সে সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করল। হেপবার্নদের যেন লোকে ভুলে যেতে লাগল আর তার জায়গায় এগিয়ে এলো আর একটি মানুষ, ঘোড়ায় চড়ে যে সারাদিন ঘুরে ফিরছে মহালে মহালে। কখনো বাঁ হাতখানায় তার ধরা আছে একটা তলোয়ার, নয়তো কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা বন্দুক। উড়ন্ত পাখি শিকার করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে আশপাশের পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে। শাসনে দাপটে সেদিন সবার চোখে ফলমন এক দুরন্ত বিস্ময়।

জানো, মেরী, আমার বাবার অবস্থাটা সে সময় হয়েছিল সাপের বেঙ গেলার মত।

কি রকম!

বাবা প্রকৃতিতে অত্যন্ত সৎ ছিলেন, কিন্তু সদ্য বিধবা এমিলি তখন বাবার ধ্যান জুড়ে বসেছেন। তাই তাঁকে নিয়ে বাবা তখন ঘুরে ফিরছেন কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, সিমলা। এদিকে নায়েবমশায় মাঝে মাঝে ফলমনের দুঃশাসনের কথা জানিয়ে গোপন চিঠি লেখেন। ফলমন তীক্ষ্ণ নজরে ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে থাকে বাবার কাছে। সে একথা ভাল করেই জানে যে, প্রেমের প্রথম পর্বে মানুষেব প্রয়োজন অমিত অর্থ। এইভাবে যথেচ্ছ অর্থ পাঠিয়ে সে বাবার হাতকে যেমন তাঁর বান্ধবীর কাছে মুক্ত করে দিয়েছিল, তেমনি বন্ধ করে দিয়েছিল তাঁর মুখ। প্রজাদের দিক থেকে ফলমনই তাঁর দৃষ্টিকে সরিয়ে নিবদ্ধ করে রেখেছিল প্রণয়িনীর দিকে।

এবার কথার মাঝে বাধা দিয়ে মৈত্রেয়ী বলল, কিছু যদি মনে না কর তাহলে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে।

অ্যানা বলল, বল।

আচ্ছা, তোমার বাবা কি তোমাকে আগের মত ভালবাসতেন সেই দিনগুলিতে?

হাসল অ্যানা। বলল, বাবা যদি আমাকে ভাল না বাসতেন তাহলে আজ আমি এতবড় নীলকুঠির মালিক হয়ে বসতে পারতাম কি করে বল? বাবা 'হোমে' ফেরার সময় কিছু টাকা নিয়ে যান, বাকী সবই উইল করে দিয়ে গেছেন আমার নামে।

একটু থেমে অ্যানা আবার বলল, আমি তোমারই মত বাবাকে এক-সময় ভুল বুঝেছিলাম, কিন্তু সে ভুল ভাঙতে আমার দেরি হয়নি।

একসময় বাবা তাঁর ভ্রমণ শেষে ফিরে এলেন নীলকুঠিতে। তারপর কয়েকদিন ধরে ফলমনের সঙ্গে তাঁর কি সব কথা হল জানি না। শেষে একদিন জানতে পারলাম, ফলমন আর আমাদের কুঠির কাজে

থাকছে না। বাবা তাকে নতুন এক নীলকুঠি পত্তনের জন্য বিপুল টাকা দিয়ে বিদায় করলেন।

একে বিদায় না বলে আত্মরক্ষা করলেন বলাই বুঝি ঠিক। এরপর আমাকে ডেকে বাবা বললেন, তোমার কাছে দুটো পথ খোলা আছে অ্যানা। এক, আমার সঙ্গে 'হোমে' ফিরে যাওয়া, নয়তো এখানে এই নীলকুঠির ভার নিয়ে থাকা।

তিনি আরও বললেন, তুমি বয়সে একেবারে তরুণ, কিন্তু আমি তোমার মনের গঠনের ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখি। তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, এই নিঃসঙ্গ জীবন হয়তো তোমার ভাল লাগবে না। তুমি আমার সঙ্গে 'হোমে' ফিরলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

আমি কিছুক্ষণ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন, এখুনি দরকার নেই, বেশ কয়েকদিন চিন্তা করে উত্তর দিও।

রাতে শুয়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেয়ালে দেখলাম আমার হারিয়ে যাওয়া মায়ের ছবিখানার ওপর একটুকরো চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার মাকে ঘিরে। এই নদী, এই বন, এই পাহাড় সবই তিনি একদিন দেখেছেন দুটি চোখ ভরে। তাঁর সকল আনন্দ-অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছেন তাঁর স্বামী। ক্লান্ত হয়ে যখন বাবা ফিরেছেন কর্মক্ষেত্র থেকে তখন মা তাঁকে বাতাস করেছেন নিজের হাতে। এ দেশীয় মেয়েদের মত স্বামী সেবার সকল দায়িত্ব তিনি তুলে নিয়েছিলেন আপন হাতে। এখনও একটি কারুকার্য করা হাত-পাখা আমার আলমারীতে রয়েছে, আমার সেবাময়ী মায়ের হাতের স্পর্শ মাখা।

আমি উঠে এলাম বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে। মায়ের হাতে পোঁতা একটি চাঁপার গাছ অজস্র ফুল ফুটিয়ে রাতের বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে চলেছে। আমি প্রাণ ভরে ঘ্রাণ নিলাম।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখে জল এলো। ঐ ত

আমাদের বাগানের একপ্রান্তে কামিনী গাছের তলায় শ্বেত পাথরে গড়া আমার মায়েব কবর। মনে মনে বললাম, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না মা। আমি তোমার পাশে পাশেই থাকব।

পরের দিনই আমি বাবাকে আমার মতামত জানিয়ে দিলাম।

বাবা আমার হাতে তাঁর উইলখানা তুলে দিয়ে বললেন, আমি জানি, তোমার হাতে আমার এই বিস্তীর্ণ জমিদারির ভার তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। দেশে চলে যাবার আগে গভীর স্বস্তি নিয়ে যেতে পারব, এ ধারণা এখন আমার দৃঢ় হয়েছে। যদি কোনদিন তুমি আমাদের কাছে ফিরে যেতে চাও তাহলে সে পথও খোলা রইল তোমার জন্যে।

মৈত্রেয়ী বলল, তোমার কথা শুনে তোমার বাবাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে!

অ্যানা বলল, আমার বাবা নতুন করে তাঁর সঙ্গিনী নির্বাচন করেছিলেন বলে আমি কিন্তু একটুও দুঃখিত হইনি মেরী। তিনি যে নীলকর সাহেবদের থেকে আলাদা ছিলেন, প্রজাদের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ছলনার আশ্রয় নিতেন না, এই গুণগুলোই তাঁর ওপর আমার ভালবাসা আর শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে রেখেছে।

এরপর দুজনেই নীরব। সুবর্ণরেখার স্রোতধারায় চাঁদের আলো পড়ে শতখণ্ড মুকুরের মত ঝলমল করছে।

অ্যানা ঐ দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আমরা আমাদের মূল কাহিনী থেকে এখন অনেকখানি দূরে সরে এসেছি মেরী। সেই হাতকাটা ফলমনের কথা বলব বলেই তোমাকে ডেকে এনেছিলাম এখানে তাই না?

মৈত্রেয়ী বলল, হ্যাঁ দিদি তাই।

অ্যানা বলল, একদিন আমি ফলমনের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েই পড়েছিলাম। আর এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমাকে অনেক তথ্যই জুগিয়েছিল।

মৈত্রেয়ী তাকিয়ে রইল অভাবিত কোনকিছু শোনার আশায়, আর অ্যানা বলে চলল তার অভিজ্ঞতার কাহিনী।

তুমি আমাকে প্রশ্ন ক'রো না মেরী যে কেমন করে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তবে একটি যুবক আর একটি তরুণীর পাশাপাশি অবস্থান তাদের অচিরেই ঘনিষ্ঠ করে তুলল।

আমি প্রথম দিকে ফলমনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলাম। একটি হাত হারিয়েও সে যে-রকম দক্ষতার সঙ্গে বন্দুক চালাতে আরম্ভ করল তাতে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। এরপর একটি দিনের ঘটনায় সে আমার মন হরণ করল।

একটু থামল অ্যানা। হেসে তাকাল মৈত্রেয়ীর দিকে।

তুমি ভাবছ এত 'সহজে কি করে আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম ?

মৈত্রেয়ী বলল, আমি কিছুই ভাবছি না দিদি। আমি শুধু তোমার মুখ থেকে ঘটনাগুলো শোনার জন্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছি।

শোন তাহলে সেদিনের ঘটনা।

অ্যানা একটু নড়ে চড়ে বসে কথা শুরু করল, আমাদের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে বড়দিন একটি বিশেষ স্মরণীয় উৎসবের দিন। আমরা সারা বছর নিজেদের কাজকর্মে বিচ্ছিন্ন থাকলেও ঐ দিনগুলোতে একসঙ্গে অনেকেই সমবেত হই। পান ভোজন, আনন্দ উৎসবের সঙ্গে আমরা একটি অনুষ্ঠান চালু করেছিলাম এই অঞ্চলে। বাবাই করেছিলেন, সেই পরিকল্পনা, আবার তিনি দেশে চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা বন্ধ হয়ে যায়।

অনুষ্ঠানটি হল ঘোড়দৌড়ের। ঐ যে দূরে পাহাড় দেখছ, ওখানে একটি শালগাছের কাণ্ডের সঙ্গে মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত একটি টাকার থলে। ঐ টাকার ভেতর কিছু সোনার মুদ্রাও থাকত। সুবর্ণরেখার ওপারে অশ্বারোহীরা হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিত তারা। তারপর ঐ পাথুরে রাস্তা পেরিয়ে ঐ পাহাড় লক্ষ্য

কবে ছুটে যেত ঘোড়সওয়ারের দল। যে আগে পৌঁছত সে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে কেটে ফেলত দড়ি। তারপব সে সেই টাকার থলি নিয়ে ফিবে আসতো যাত্রারম্ভের জায়গায়। বিজয়ীর প্রাপ্য ছিল সেই থলে ভর্তি মুদ্রা। আরও অতিরিক্ত কিছু পাওনা যে তার ছিল না তেমন নয়, কুমাবী মেয়েদের অদৃশ্য অন্তরকেও সে ছিনিয়ে নিত।

এই ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র কবে গড়ে উঠত নীলকব সাহেবদেব অলিখিত মর্যাদাব লড়াই। কারণ প্রতিটি নীলকুঠির মালিকই তাদের প্রতিনিধি হিসেবে এক একজন অশ্বারোহীকে এই প্রতিযোগিতায় পাঠাত। তাদের জয়, পবোক্ষভাবে নীলকুঠিরই জয়।

ফার্গুসন সাহেবেব নীলকুঠির অশ্বারোহী হোসেন খাঁ ছিল জাতিতে পাঠান। প্রতিবছর এই দীর্ঘদেহী পাঠান যুবাই জয় কবে নিত প্রতি-যোগিতা। বহু দূব দূব অঞ্চলের নীলকুঠি থেকে আসত প্রতিযোগীর দল। বছবে বছরে এ সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। অনুষ্ঠানের আগে থেকেই ঐ প্রান্তরে সম্ভাব্য প্রতিযোগীবা চালাত মহড়া। তাবপব প্রতিযোগিতার দিনে নানাভাবে সাজানো হত আমাদেব হল ঘর। নিমন্ত্রিত, অভ্যাগতদের ভিড়ে আমাদের নীলকুঠি হয়ে থাকত সরগরম। ব্যাণ্ড বাজান হত। সেপাইরা কুচকাওয়াজ কবত। তারপর শুরু হত সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ শেষের অনুষ্ঠানটি।

সেবাব আমাদের নীলকুঠির তবফ থেকে এগিয়ে এলো ফলমন। বাবা তার দৈহিক অক্ষমতার জন্যে বারণ করেছিলেন, কিন্তু সে কথা সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, আমাদের নীলকুঠি কোনবারেই যখন জয়ী হতে পারেনি, তখন এবারেও হবে না ধরে নিতে পারি। তাহলে পুরাতন লোকটিকে বার বার প্রতিযোগিতায় না নামিয়ে নতুনকে একটু সুযোগ করে দিলে ক্ষতি কি।

বাবা হেসে বললেন, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক ফলমন। যীশু তোমাকে জয়ী করুন।

আমবা জানতাম হোসেন খাঁর কাছে এদেশী বিদেশী সব ঘোড়-

সওয়ারকেই হার মানতে হবে। অনুষ্ঠানের আগে যে যত হাঁকডাকই করুক না কেন ভাগ্যে তার পরাজয়ই লেখা থাকত।

সেদিন অনুষ্ঠান শুরু হতে দেখা গেল একটি নীল স্কার্ফে মুখ ঢেকে কালো একটা ঘোড়ার ওপর স্থির হয়ে বসে আছে ফলমন। শুধু দুটো চোখই তার দেখা যাচ্ছিল।

অনেক প্রতিযোগী এসেছিল বিভিন্ন নীল কুঠির প্রতিনিধিত্ব করতে। হোসেন খাঁ প্রতি বছরের মত এবারও মুখ ঢেকেছিল একটি কালো স্কার্ফে। তার তেজীয়ান লাল ঘোড়াটা বার বার চিঁহি চিঁহি শব্দ করে সামনের পা দুটো দর্শনীয় ভঙ্গীতে শূন্যে তুলছিল।

সহসা বন্দুক গর্জে উঠল। মনে হল যেন কতকগুলো ক্ষুধার্ত চিতা পলায়মান কোন পশুকে ধরবার জন্যে শূন্যে লাফিয়ে চলেছে। পা মাটি স্পর্শ করছে কি করছে না সঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ক্রমশঃ ঘোড়াগুলো তাদের সওয়ার নিয়ে এক একটি বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেল। একসময় বনের আবছায়ায় মিলিয়ে গেল ওরা।

কতক্ষণ পরে দেখা গেল ক্যানভাসের ওপর শিল্পীর ছিটোনো রঙের মত আবার বিন্দুগুলো ফুটে উঠছে চোখের সামনে।

হ্যাঁ, একটা কথা। যদি কোন প্রতিযোগী সেই শালগাছের কাছে প্রদত্ত সীমারেখা ছুঁয়ে টাকার থলি সংগ্রহ করতে না পেরেও সবার আগে সমাপ্তির জায়গায় ফিরে আসে তাহলে এই অনুষ্ঠান আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। টাকার থলি নিয়ে সবার আগে ফিরে আসতে না পারলে পণ্ড হয়ে যেত প্রথমবারের খেলা।

ওরা ফিরে আসছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল কেউ কারো থেকে যেন পিছিয়ে পড়ে নেই। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। দর্শকেরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে।

আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম। সামনে এগিয়ে আসছে কালো ঘোড়ার সওয়ার। ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে সে যেন একেবারে মিশে আছে। ঠিক তার পেছনে হোসেন খাঁর লাল ঘোড়াটা যেন এই মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়বে কালো ঘোড়ার সওয়ারের ওপর।

সকলে দেখল হোসেন খাঁর হাতে চক্‌ চক্‌ করে ঝিলিক দিচ্ছে একটা খোলা তলোয়ার। মনে হচ্ছে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে পাঠান। তলোয়ার চালাতে লাগল সে।

দেখলাম মুহূর্তে ফিরে দাঁড়াল ফলমন। সে তার তলোয়ার বের করে নিয়েছে। আমরা এপার থেকে দেখলাম, বুকের কাছে যে টাকার থলেটা ফলমন চেপে রেখেছিল সেটা পড়ে গেল মাটিতে। ফলমন লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। টাকার থলেটা তুলতে যাচ্ছিল, আমরা চীৎকার করে উঠলাম। হোসেন খাঁ তলোয়ার তুলেছে ফলমনের গর্দান লক্ষ্য করে। বেজি যেমন করে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই সাপের বিদ্যুৎগতি অব্যর্থ লক্ষ্যকে এড়িয়ে সরে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি সরে গেল ফলমন। না, শুধু সরে গেল না, সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক ক্ষিপ্রতায় আঘাত হানল।

হোসেন খাঁর হাতে ধরা ঘোড়ার লাগাম কেটে দু টুকরো হয়ে গেল। ঘোড়াব সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে পাঠান মুখ থুবড়ে পড়ল সুবর্ণরেখার প্রসারিত চবের উপর। ক্ষণকাল মাত্র। উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু একি হল। হোসেন খাঁর দেহটা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে আছড়ে পড়ল। ফলমনের তলোয়ার ততক্ষণে পাঠানের বুকখানাকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিয়ে স্ব-স্থানে স্থির হয়ে গেছে।

ফার্গুসন ক্ষেপে গিয়ে ফলমনকে তাক করে বন্দুক তুললেন। বাবা তাঁর হাতখানা ধরে না ফেললে ফলমন সেদিন এই সুবর্ণরেখার চরেই চিরদিনের মত হারিয়ে যেত।

নীলকরদের বিচাবে ফলমন নির্দোষ প্রমাণিত হল। কারণ সেদিন যারাই হাজির ছিল সেখানে তাদের কারোই চোখ এড়ায়নি হোসেন খাঁর অশিষ্ট আচরণ। প্রতিযোগীরাও সাক্ষী দিল ফলমনের সপক্ষে। ওদের নাকি অনেকখানি ব্যবধানে ফেলে ফলমন টাকার থলি নিয়ে ফিরে পড়েছিল, হোসেন নির্দিষ্ট রেখা স্পর্শ না করেই ওর পিছু নিয়েছিল। তাকে ক্ষিপ্ত হয়ে শুধু বলতে শোনা গিয়েছিল, সেদিন বেঁচে গিয়েছিস প্রাণে, আজ তোকে সাকিনার কবরে পাঠিয়ে দেব।

না, সেদিন ফলমনকে কবরে যেতে হয়নি, হোসেন খাঁই কবরে গিয়েছিল।

মৈত্রেয়ী বলল, হোসেন যে সাকিনার নাম করেছিল তার বিষয়ে তোমরা কি কেউ কিছু জানতে পেরেছিলে? আমার তো মনে হয় হোসেন খাঁই ফলমনের হাতখানা তলোয়ারের কোপে কেটে ফেলেছিল। ওদের ভেতর হয়তো কোন পূর্ব-বৈরিতা থেকে থাকবে।

অ্যানা বলল, তোমার ধারণাটাই বর্ণে বর্ণে ঠিক মেরী। আমি ফলমনের রহস্যময় জীবনেব এ দিকের কিছু খবর পরে সংগ্রহ করেছিলাম। আমাদের নীলকুঠির মোড়ল গোলক মুর্মুই সে খবর দিয়েছিল।

কি রকম? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল মৈত্রেয়ী।

গোলক মুর্মু ফাগুর্সনের ওখানে কাজ করত। সে সময় হোসেন খাঁর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয় তার। সে তাই জানতে পেরেছিল ওদের কিছু গোপন কাহিনী।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে দেখে অ্যানা বলল, সে কাহিনীর শুরু লাহোরে আর শেষ এই সুবর্ণরেখার তীরে।

লাহোরের এক ফলওয়ালীর প্রেমে পড়েছিল দুই বন্ধু, ফলমন আর হোসেন খাঁ।

বাধা দিয়ে বলল মৈত্রেয়ী, কিন্তু ফলমন আর হোসেন খাঁর ভেতর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল কি করে! দু'জনে তো এক সম্প্রদায়ের লোক নয়?

লাহোরে কোম্পানীর কাজ দেখা শোনা যিনি করতেন, তাঁরই কর্মচারী ছিল ফলমন। আর ঐ হোসেন খাঁ ছিল একদল ঠগীর সর্দার।

ঠগীর!

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল মৈত্রেয়ীর দু'চোখ।—শুনেছি, ঠগীরা নাকি ফাঁস লাগিয়ে মানুষ গুম করে ফেলে।

অ্যানা বলল, হাঁ, সেই ঠগীর দলের সর্দার ছিল হোসেন খাঁ। আর তাকে খবরাখবর দিয়ে পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করত ফলমন।

অ্যানা এবার প্রশ্ন করল মৈত্রেয়ীকে, শ্লীম্যান সাহেবের নাম শুনেছ কোনদিন ?

মৈত্রেয়ী মাথা নেড়ে জানাল যে সে কোনদিন ও নাম শোনেনি।

অ্যানা বলল, এই শ্লীম্যান সাহেব তোমাদের দেশ থেকে ঠগীদের উচ্ছেদ করে সারা ইণ্ডিয়ার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

আচ্ছা মেরী, কিছুকাল আগে আমার বাড়ীতে গার্ডেন পার্টি হয়েছিল, তাতে একজন ক্যাপ্টেন এসেছিলেন, তুমি তাঁকে লক্ষ্য করেছ কি ? আমার ঘরের জানালার ভেতর দিয়ে তুমি তো নিমন্ত্রিতদের সবাইকেই দেখতে পাচ্ছিলে। সেই যে মিলিটারী পোশাক পরা সব চেয়ে লম্বা মানুষটি, তাঁর কথা মনে পড়ছে কি ?

যিনি সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আলাপ করছিলেন ? হাতে একটা ছড়ি ছিল। উনিই কি তাহলে সেই শ্লীম্যান সাহেব ?

না না, উনি কেন শ্লীম্যান হতে যাবেন। তবে তোমার অনুমানটা কাছাকাছি পৌঁছেছে। উনি শ্লীম্যান সাহেবেরই ঠগী দমনের অনুচর। ওঁর নাম ক্যাপ্টেন ভ্যালান্স। মেদিনীপুর জেলায় ঠগী দমনের ভার নিয়ে উনি কাজ করে যাচ্ছেন।

মৈত্রেয়ী বলল, এবার তোমার সেই হোসেন খাঁ ঠগীর কাহিনীটাই বল শুনি।

হোসেন খাঁর সঙ্গে টাকা পয়সার লেনদেন ছিল ফলমনের। লাহোরের বাজারে একটি ফলওয়ালীর দোকানে ফল কেনার ছলে দেখা হত দুই বন্ধুর। তারপর প্রয়োজনীয় কথার পর ওরা সরে পড়ত।

কিন্তু একদিন ফলওয়ালী মেয়েটি হোসেন খাঁকে দেখে একটু ইঙ্গিত-পূর্ণ হাসি হেসেছিল। সারারাত তাই ঘুম এলো না হোসেন খাঁর। মেয়েটি দেখতে ছিল খুবসুরত। হোসেন খাঁ অনেক চিন্তার পর ঠিক করল, মেয়েটি যদি সত্যিই তাকে ভালবাসে তাহলে তাকে নিয়ে সে লাহোর ছেড়ে অন্য কোথাও পালাবে। আর তাছাড়া লাহোরের চারদিকে তখন ঠগীদের ব্যাবসায় মন্দা পড়েছে। কখন ধরা পড়তে

হয় সেই ভয়ে দিন গুনছে হোসেন খাঁ। ফলমন আছে, তাই এতদিন টিঁকে থাকা, না হলে কি হত বলা যায় না!

কথাটা ফলমনকে বলার আগে একবার সে বাজিয়ে নিতে চাইল মেয়েটিকে। সন্ধ্যায় ঐ দোকানেই দেখা হল তাদের। কথা হল আভাসে ইঙ্গিতে। হোসেন খাঁ বুঝল তার মত মরদানাকেই মেয়েটির পছন্দ। এক কথায় রাজী হয়ে গেল দুজনে।

এদিকে হোসেন খাঁ ছুটল তার অনেক কালের দোস্তকে এই সুখবরটা দিতে।

ফলমন সব কথা শুনল। তারপর বলল, কাল এসো কিছু কথা আছে। হট্ করে কিছু একটা করে বস না।

ফিরে যাচ্ছিল হোসেন খাঁ। আবার তাকে পেছন থেকে ডাক দিল ফলমন, শোন, পিয়ারীর কাছে যেন নিজের জাত ব্যাবসার কথাটা ফাঁস করে দিও না।

হোসেন খাঁ পাকা লোকের মত মাথা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে যা বলল তার অর্থ দাঁড়াল, এমন উজবুক তাকে ভাবছে কি করে ফলমন!

কথাটা শোনার পর থেকে ফলমনের চোখে রাতের ঘুম উধাও। মনে হল তার পাঁজরের ক'খানা হাড় যেন জ্বলছে। সেও যে এতদিন ধরে ঐ কালো চোখে সুর্মাটানা মেয়েটাকে দিল ভরে দেখে আসছে। ফল কেনার ফাঁকে ঐ মেয়েটার মুখ থেকে সে কতদিন না মিষ্টি হাসির একখানি ফাউ নিয়ে এসেছে। আজ সে কিনা হতে চলেছে একটা ঠগের বাচ্চার বাঁদী!

ফলমন ইচ্ছে করলেই এক কোপে ঐ অন্তরায়টাকে সাফ করে বসরাই গোলাপটিকে তার শোবার কামরায় তুলে এনে রেখে দিতে পারে, কিন্তু তা সে করল না। এতটা কাঁচা কাজ করার লোকই নয় ফলমন। রক্তে তার পর্তুগীজ বোম্বেটের জোয়ার, আবার ব্যবসায়ী হরিদাস শেঠের রক্তও বইছে তার দেহে।

এবার কথার মাঝে চমক লাগল মৈত্রেয়ীর। বলল, ফলমন কি তাহলে পর্তুগীজ আর বাঙালী রক্ত নিয়ে জন্মেছে নাকি?

সে প্রশ্ন এখন নয় মেরী। ওর পূর্বপুরুষের একটি রহস্যময় ইতিহাস আছে, আর সে ইতিহাস আমি অন্য কোন লোকমুখে শুনিনি, স্বয়ং ফলমনই এক সময় আমাকে তা শুনিয়েছিল।

হাঁ, যে কথা হচ্ছিল, সে কথাতেই ফিরে আসা যাক্।

ফলমন ফলওয়ালী সাকিনার আশা ছাড়তে পারল না। সে পরের দিন নিজের মনের ভাব গোপন রেখে হাসিমুখে হোসেন খাঁকে তার নতুন পিয়ারী নির্বাচনের জন্য তারিফ করল। তারপর বলল, সাদি করার পর তুমি যখন ঘর বাঁধবে তখন তোমার শত কাজ ফেলে বিবিকে নিয়ে যে কিছুকাল মশগুল থাকবে এ কথার ভেতর ফাঁক নেই দোস্ত। কিন্তু শ্লীম্যান সাহেব যে বেগে তাঁর তুরকী ঘোড়া ছোটাচ্ছেন তাতে তোমার কাছে পৌঁছতে তাঁর বড একটা দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে না। আর এদিকে নতুন বিবি যদি তোমার পেশার কথাটা জেনে ফেলে তাহলে ত চারদিক অন্ধকাব।

হোসেন খাঁ ঠিক সেই মুহূর্তে ফলমনকে তার সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী বলে ভেবে বসল।

তোমার ওপর এ ব্যাপারের ফয়সালাব ভার রইল দোস্ত। তোমার যুক্তি মতই আমি চলব।

ফলমন বলল, আরও কটা দিন আমাকে সময় দাও। জান ত সবুরে মেওয়া ফলে। তোমার সব ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে এখন নিশ্চিন্তে থাকতে পার।

হোসেন খাঁ চলে গেল। ফলমন নতুন করে ছক পেতে দাবার ঘুঁটিগুলো চাল্‌তে লাগল।

না, শুধু চাকরির টাকাতে তার পোষাবে না। ছেলেবেলা বাপমাকে হারিয়ে সে একাই পথ চলতে শিখেছে। সুতরাং টাকা রোজগার করতে হয়েছে তাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। টাকার কদর সে বোঝে।

তাই যতদিন পারা যায় হোসেন খাঁ লোকটাকে জিইয়ে রাখতে হবে তার। তাকে ঐ ঠগের ব্যাবসার ভেতরেই ফেলে রাখতে হবে। সাচ্চা ঠগী হোসেন খাঁ ভাগের টাকা মারবে না এক পয়সাও।

ফলমন ভেবে দেখল সাকিনা বেগম আর হোসেন খাঁকে নিয়ে সরে পড়তে হবে এ জায়গা ছেড়ে। শ্লীম্যান সাহেব এখন নিপুণ শিকারীর মত জব্বলপুরে জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁর পাতা জালে রোজই ধরা পড়ছে বাঘা বাঘা ঠগীর দল।

ফলমন ভাবল, মাঝামাঝি কোন জায়গা নয়, একেবারে সে হোসেন খাঁকে নিয়ে তুলবে বাংলা দেশের শেষ প্রান্তে। যতদিন চালানো যায়, হোসেন খাঁর হাতের খেলা চলবে সেখানে। তারপর সুযোগ এলে সুর্মা টানা দুটি চোখের নজরকেও সে তার দিকে ফেরাতে পারবে।

সুযোগ এসে গেল ফলমনের হাতে। চেষ্টা করতে হল খুব সামান্যই।

মেদিনীপুর জেলার খেজুরীতে তখন কোম্পানীর বন্দর রয়েছে। খেজুরী বন্দর থেকে বিভিন্ন জায়গায় কাজ কারবার চলেছে জাহাজে, নৌকোয়। দেশী, বিদেশী সকল রকম লোকের আনাগোনা, বসবাস সেখানে। ব্যাবসার জায়গায় হোসেন খাঁরও ব্যাবসা চলবে ভাল তাই খেজুরীতে পোস্ট আফিসের একটি বিভাগে কাজ খালি আছে জেনে উমেদার হল ফলমন, আর সঙ্গে সঙ্গেই সে বহাল হয়ে গেল সে কাজে।

হোসেন খাঁ, সাকিনা বিবি মোটঘাট বেঁধে চলে এল, ফলমনের সঙ্গে বাংলা মুল্লুকে। পোস্ট আফিসে কাজ নিল ফলমন। তার বাবুর্চি আর খানসামার কাজ নিয়ে রইল সাকিনা আর হোসেন খাঁ।

লোকে ওদের এই পরিচয়ই জানল। এদিকে হোসেন খাঁর দল গড়ে নিতে বেশী বেগ পেতে হল না। জহুরী জহর চেনে। হল্‌দি নদী বয়ে গেছে খেজুরী বন্দরের কয়েক মাইল দূর দিয়ে। ওখানে হোসেন খাঁ কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে বুঝল লাটে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে যে সব নৌকো যাত্রীদের অপেক্ষায় ভিড় জমায় তাদের ভেতর অন্ততঃ দু'চারটে 'ভাগিনা'র নৌকো আছে।

মৈত্রেয়ী এবার প্রশ্ন করে বসল, 'ভাগিনা' কারা দিদি?

হেসে বলল অ্যানা, এও জান না? 'ভাগিনা'রা হল ঠগীদের সেরা।

বাংলা দেশের নদীতে এইসব ভাগিনার নৌকো যাত্রী নিয়ে যাবার জন্যে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। ঠগীদের কেউ কেউ ঐ নৌকোব ওপর বসে থাকে যাত্রী সেজে। আবার কেউবা যাত্রীর বেশে ঘুরে বেড়ায় ডাঙায়। তারপর একই যাত্রার সঙ্গী হবার নাম করে ওরা সত্যিকারের যাত্রীদের নৌকোয় এনে তোলে।

একসময় নৌকো ভেসে চলে স্রোতের টানে। নকল যাত্রীরা এবাব তৈরী হয়ে নেয়। তাবা ঘিরে বসে আসল যাত্রীদের। তারপর নৌকোর মাঝি পাটাতনে বসে তিনবার হালে ঘা মেরে সংকেত করলেই হতভাগ্য যাত্রীদের গলায় মুহূর্তে লেগে যায় ফাঁস। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভবলীলা শেষ। এবপর সমুদ্রে বিসর্জন দিতে তাদেব বেশী সময় লাগে না। তাদের মালপত্র আব টাকা পয়সা তখন সকলে মিলে মহানন্দে ভাগ করে নেয়।

মৈত্রেয়ী চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছিল। কথা শেষ হতেই সে বলল, ও কথা আর বোলো না দিদি। আমি যেন চোখের ওপর সেই সব অসহায় মানুষগুলোর দম বন্ধ হয়ে আসা মুখের ছবি দেখতে পাচ্ছি।

অ্যানা বলল, ভয় নেই মেরী, তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। ওরা এখন শ্লীম্যানেব জালে বন্দী।

এরপর একটু থেমে আগের কথার খেইটা যেন কুড়িয়ে নিল অ্যানা।

হোসেন খাঁ দল গড়ে তুলল। ঠগী সে। ফাঁস পরানোই তার কাজ। জলে হোক আর ডাঙায় হোক। ডাঙা থেকে এবার জলে ভাসল হোসেন খাঁ। এখানেও ফলমন তাকে সাহায্য করতে লাগল। পোস্ট আফিসে যে সব ব্যবসায়ীর টাকা আসত তারা সে টাকা তুলে নিয়ে যে যার গদিতে ফিরে যেত। এই টাকা তোলা আর ফেরার খবর নির্ভুলভাবে পেয়ে যেত হোসেন খাঁ। তারপর স্থলে জলে ছলচাতুরী করে সে হরণ করত ব্যবসায়ীর ধন আর প্রাণ।

এমনি করে হোসেন খাঁর কাজ কারবার চলল কিছুদিন। ফলমনও ভাগের টাকায় ফুলতে লাগল।

কিন্তু সাকিনাতেই তখন ফলমনের দু'চোখের নজর। হোসেন খাঁ কারবার গুটোবার আগে চারদিক থেকে লুটেপুটে আনছিল। সারা জীবনের সঞ্চয় ব্যাবসায় লাল বাতি জ্বলবার আগেই তাকে তুলে নিতে হবে। নিপুণ শিকারী তাই ঘরের দিক থেকে নজরটা তুলে নিয়ে ফেলেছিল পথের ওপর। সেই সুযোগটুকু কাজে লাগাতে একটুও দেরি করল না ফলমন।

একদিন সে সাকিনাকে বলল, তোমার সেই ফলওয়ালী রূপটা দেখতে আমার আরও বেশী ভাল লাগে সাকিনা।

তেমনি করে মিষ্টি হাসি ফিরিয়ে দিল সাকিনা। লাহোরের বাজারে যেমন করে সুর্মা টানা চোখেব তারা ওপবে তুলে হাসত।

ফলমন বলল, কতদিন তোমাকে এমন করে হাসতে দেখিনি সাকিনা। আজ বড় ভাল লাগল। দুঃখ হয় হোসেন আজকাল এ হাসি আর দেখতে পায় না।

নত হল সাকিনার মুখ। ফলমন সে মুখের আয়নায় দেখতে পেল আর একখানা ছবি। সে ছবি হোসেন খাঁর নয়, যেন আর কার। অস্পষ্ট, ভাল করে তাই দেখা গেল না।

তারপর ক'দিন বাদে সাকিনার মুখে চোখে খেলতে লাগল হঠাৎ এসে পড়া আলোর ঝিলিক। হোসেন খাঁ ঘরে এলেই মিলিয়ে যায় সে আলো। আবার যখন সে কাজে বেরিয়ে যায়, আর ফলমন ঘরে এসে ঢোকে তখন কোথা থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে সে আলো।

লাহোর থেকে এত দূরে এসে শেষ পর্যন্ত জয়ী হল ফলমন। জয় করে নিল সে সাকিনা বিবির গোলাপ-রাঙা দিল। হোসেনকে কাজের পর কাজে পাঠায় ফলমন। তারপর একা ঘরে সাকিনার দেখা। বাঁদী থেকে সাকিনা বিবি তখন বেগম।

এদিকে প্রেম হৃদয়ে যখন আলো জ্বালে তখন হরণ করে নেয় চোখের দৃষ্টি! তাই মগ্ন দুটি পক্ষীমিথুন যখন কূজন করে ফিরতে লাগল তখন তাদের চোখে পড়ল না যে তাদের এ গান আড়ালে আবডালে থেকে আর একজন শুনছে। সে হল জাত-ব্যাবসায় ব্যাধ।

বনের পাখি সে শিকার করেছে এতকাল। এখন ঘরের বেইমান চিড়িয়াকে ফাঁস পরাবার জন্যে হাত দুটো তার নিস্‌পিস্‌ করতে লাগল।

হোসেন খাঁ মনস্থ করল, এই শিকারই তার শেষ শিকার। এরপর সাগরের জলে স্নান করে সে বিলকুল পাল্‌টে ফেলবে তার ব্যাবসা।

প্রস্তাবটা সে-ই নিয়ে এলো। আসছে পূর্ণিমায় দরিয়াপুরের চরে সে নিয়ে যাবে সাকিনাকে। জায়গাটা নাকি এতই সুন্দর যে বিবিকে সেটা না দেখালে তার আর সোয়াস্তি নেই। বন আর নদী মিলে সে নাকি এক অন্য জগৎ।

স্বামীর মন রাখতে সাকিনাকে উচ্ছ্বসিত আবেগে ফেটে পড়তে হল। নির্দিষ্ট দিনে নদীর বুকে ভাসল তরী।

নিখুঁত দাঁড়ের টানে হোসেন খাঁ তার বিবিকে এনে তুলল আলোর বান-ডাকা দরিয়াপুরের চরে।

চাঁদের আলোর চেয়েও যেন উপচে পড়ছিল সাকিনার আনন্দ। শতমুখে সে কলকল করে উঠল। তারপর কপট অভিমানে মুখ ভার করেই বসল। এতদিন তাকে হোসেন কেন এমন একখানা দর্শনীয় জায়গা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল!

হোসেন জাত-ঠগী, তাই অভিনয়ে কারো চেয়ে সে কম যায় না। গাছের তলায় ভক্ত সেজে কতদিন তাকে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ভজন গাইতে হয়েছে। কতদিন বা পথের ধারে কান্নায় ভেঙে পড়ে অভিনয় করতে হয়েছে সর্বহারা পথিকের। তারপর সবার করুণা কুড়িয়ে সঙ্গ নিয়েছে পথচারীর। শেষে যখন সে ফিরেছে তার মৃগয়া থেকে তখন হোসেন খাঁ একেবারে দিগ্বিজয়ী সম্রাট।

চড়ুই ভাতির আয়োজন করেছিল হোসেন। এমন জায়গায় চড়ুইভাতি একটা সখের ব্যাপার বইকি।

সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সাকিনা। সে তাকে হেসে সরিয়ে দিল সেখান থেকে। বলল, তুমি এই চরের চারদিকটা একবার ঘুরে দেখ, ততক্ষণে আমি নৌকোর ভেতর খানাটা তৈরি করে নিয়ে আসছি।

সাকিনা চাঁদের আলোর বান্‌-ডাকা সেই চরে আপন মনে ঘুরে ফিরতে লাগল। নদী এখানে বিরাট আকার নিয়ে সাগরের দিকে এগিয়ে গেছে। ধূ ধূ চরের মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ের মত বালির স্তূপ। চাঁদের আলোয় সোনার মত ঝলমল করছিল। দূরে দূরে আবছা বনের রেখা, কেমন যেন মায়া আর রহস্যে ভরা! সাকিনার মনটা কেঁদে উঠল। এমন অপরূপ জায়গায় যদি আর একটা মানুষ আজ তার কাছে থাকত। তার মনে হল, চাঁদের আলো যেন কান্নার শিশির ঝরাচ্ছে।

ওদিকে নদীর জলে আলোছায়ার স্বপ্নমাধুরী। হয়তো গাঙচর পাখির ঝাঁক দিন ভ্রমে উড়ে যাচ্ছিল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে পাখা টেনে টেনে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল কেমন এক বিচিত্র শব্দ। সাকিনা পায়ে পায়ে অনেক দূর এগিয়ে এলো। ওদের নৌকোটা আর দেখা যাচ্ছে না। নদী থেকে চরের ওপর উঠে আসবার পথটা একদম খাড়াই। খাড়াইয়ের সেই আবছায়ার ভেতর কোথাও হয়তো আছে তাদের নৌকো। হোসেন বলেছে এগিয়ে যেতে। সামান্য একটুখানি খাবার তৈরি করে নিয়ে সে এখুনি হয়ত এসে যাবে তার কাছে।

কিন্তু কেন যেন আজ এই আলোয়-ধোয়া নদীর চরে কিছুতেই মন চাইছে না হোসেনকে কাছে পেতে। বিবাহিত জীবনে ক'দিন সে পেয়েছে তার স্বামীকে একান্ত আপনার করে! তার দিকে তাকিয়ে, তার কথা ভেবে একদিনও কি হোসেন তার কাজ ভুলেছে!

সারাদিন, সারারাত শুধু কাজ আর কাজ। নৌকো চালিয়ে লোকে এত টাকাও রোজগার করে!

আজ একা এই নির্জন নদীচরে ঘুরতে ঘুরতে সাকিনার মনে অনেক কথাই ভিড় করে এলো। আজ প্রথম সন্দেহ এলো তার স্বামীর ওপর। নিশ্চয়ই চুরি ডাকাতি কিছু একটা করে থাকে হোসেন! না হলে এত সোনাদানা সে আনে কোথা থেকে! ঘৃণায় শরীরটা তার রী রী করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল ফলমনের মুখ। চোখ দুটি থেকে যেন

তার সুধা উপচে পড়ছে। এত মিষ্টিও ঝবে মানুষেব মুখেব কথা থেকে। এই দুটো মানুষ কেমন কবে বন্ধু হয়েছিল তা ভাবতেও অবাক লাগে সাকিনা বিবিব।

আফিসেব কাজটি শেষ হলে বাংলোয় ফিবে আসে ফলমন। টিফিন সেরে কেমন পোষা কুকুবটাকে নিয়ে বাগানেব চাবদিকে ঘুরে বেড়ায় সে। তাবপব বেলা শেষেব কিছু আগে সাদা ঘোড়াব পিঠে সওয়ার হয়ে বেবিয়ে যায় নদীব দিকে। সে যেন পরীব দেশেব বাজকুমাব।

আবাব বাগও হয ফলমনেব ওপব। সেই যদি তাব মনেব শাখায ফুল ফোটাতে এলো ফলমন, তাহলে এত দেবিতে কেন? এই দো-টানাব বাঁধন আব তাকে সইতে হবে কতদিন!

ভাবনায় ছেদ পড়ল। পাযে পাযে অনেক দূর চলে এসেছে সে। সামনে একটি দর্শনীয় সোনালা বালিব পাহাড়। এতক্ষণ এই পাহাড়টাকে লক্ষ্য কবেই সে হাঁটছিল। কি একটা আওয়াজ তাব কানে ভেসে আসছিল। ভাবনাব মাঝে থেকে সে ভাল কবে কান দেয়নি এদিকে। শব্দটা নদী আব সাগবেব মিলন থেকে জেগে উঠছিল। একটা উচ্ছ্বসিত আবেগ যেন আছড়ে পড়ছিল বেলাভূমিতে বার বার। সাকিনাব মনেও কি লাগছিল সেই আথাল পাথাল ঢেউয়েব দোলা।

কে! কে ও! বিস্ময়ে চমকে উঠল সাকিনা। চোখ দুটো ভাল করে মুছল সে। তাকাল চাবদিকে। না, সবই তো ঠিক আছে। তেমনি চাঁদের আলো, তেমনি বালিব পাহাড়গুলো। আবার তাকাল সে সামনে।

হাঁ, সামনেব বালির পাহাড়েব আড়াল থেকে ফলমনই তো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে আনন্দে কি পাগল হয়ে যাবে। সাকিনা দৌড়ে গেল কিছুটা। তারপব কেমন একটা ভয়ে সে চমকে থেমে গেল। প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়া জন্তু যেমন কবে কিছু পথ দৌড়ে গিয়ে থেমে যায়, তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে তার অনুসরণকারী আসছে কিনা, ঠিক তেমনি করে পেছন দিকে একবার তাকাল সাকিনা।

না, বহুদূরে সে ফেলে এসেছে তার মানুষটাকে। যেন একটা আবছায়ায় মিলিয়ে গেছে তাদের নৌকোটা।

তর্ তর্ করে এগিয়ে চলল সাকিনা। বালির পাহাড়টার একধারে সে যখন এসে পৌঁছল তখন সে রীতিমত হাঁফাচ্ছিল। এক অস্বাভাবিক উত্তেজনা কাঁপিয়ে তুলছিল তার সারাটা দেহ। বিশাল বালির ঢিবিটার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে নদীর মোহনার দিকে। চর সেখানে একটা রহস্যময় অস্পষ্টতার ভেতর দিয়ে জলের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে।

সেই ছায়ার আড়ালে প্রায় নদীর মোহনার কাছাকাছি থেকে হাতছানি দিয়ে তাকে নীচে নেমে আসতে ইঙ্গিত করছিল ফলমন। স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছিল না তাকে, তবে তার পোশাক আর টুপিটাই তাকে চেনার পক্ষে যথেষ্ট। নীচে মনে হল একটা নৌকো বাঁধা আছে। ফলমন তাহলে আর একখানা নৌকোয় তাদের অনুসরণ করে এসেছে! নীচে নামবার আগে সে আর একবার পেছন ফিরে ভালো করে তাকিয়ে দেখল হোসেন খাঁর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা।

না, কেউ কোথাও নেই। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত সে তার মনের মানুষটার উত্তপ্ত সঙ্গ পেতে পারবে। এবার সে প্রায় লাফিয়েই নীচের দিকে নামতে লাগল। জলের শব্দ এখানে সব কথাকেই ছাপিয়ে উঠছে। তার ভেতর ফলমন যেন কি বলছিল। সাকিনা তা শুনতে পেল না। এবার ফলমন তাকে বাঁ দিকের ঢাল দিয়ে নামতে ইশারা করল। বালিপাহাড়ের ছায়া আর চাঁদের আলো যে জায়গাটাকে স্পষ্ট দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল তারই ওপর দিয়ে এবার নামতে লাগল সাকিনা। কিছুটা ঢাল নেমেই একটা চত্বরের মত চর। একটু ওপর থেকে ফলমনের ইঙ্গিতে প্রায় লাফ দিয়ে তার ওপর পড়ল সাকিনা।

একি! সমস্ত দেহটা যে তার পায়ের ওপর থেকে ভার হারিয়ে ফেলল! সাকিনা যেতে চাইছে কিন্তু যেতে পারছে না কেন! কে যেন তার সমস্ত ক্ষমতাকে নিঃশব্দে চুরি করে নিয়ে তাকে মুহূর্তে অসহায় করে ফেলেছে! তলিয়ে যাচ্ছে সাকিনা। ধীরে ধীরে চোরাবালুর

গুপ্ত পাতালপুরীর দিকে সে নেমে চলেছে। চেঁচিয়ে উঠল সাকিনা, বাঁ-চা-ও। দুটো হাত প্রায় ছুঁড়ে দিতে চাইল ফলমনের দিকে।

উঠে আসছে ফলমন। ঐ মৃত্যুকূপের অদূরে যেখানে চাঁদের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, সেখানে এসে দাঁড়াল সে। এত দ্রুত নেমে যাচ্ছে সাকিনা! প্রায় বুকের কাছাকাছি গ্রাস করে নিয়েছে তাকে ক্ষুধার্ত মৃত্তিকা। সাকিনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল, চাঁদের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। সে তার মাথাব টুপিখানা খুলে ফেলল মাটিতে। ধীবে ধীরে একটি একটি কবে গায়ের থেকে খুলে ফেলল ফলমনের পোশাক। তারপর একটা পৈশাচিক হাসি চরের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখত সাকিনাবিবি, মানুষটা তোমাব চেনা কি না ?

সাকিনার চোখ আরও বিস্ফাবিত হল, শুধু দুটো প্রসারিত হাত শুকনো ভাঙা ডালের মত ঐ চোরা বালুব ওপর যেন খসে পড়ল। মুখে একটি কথা নেই সাকিনার। মনে হল সে যেন কোনদিন মানুষের ভাষা শেখেনি। শুধু তার দুটো চোখ আবও আরও বিস্ফারিত হয়ে গেল।

হোসেন খাঁ পকেট থেকে বের কবল একটা হলুদ কাপড়ের টুকরো। তারপর দূরত্ব বাঁচিয়ে পাশের শক্ত ঢালু মাটির ওপর দাঁড়িয়ে সাকিনার গলায় বিচিত্র কৌশলে লাগিয়ে দিল ফাঁস।

হা-হা করে হেসে উঠে বলল, মরে গেল, তোর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরের ঠগীটা মরে গেল।

হোসেন খাঁ ছেড়ে দিল হাত। নাগালের ভেতর পেয়েও হোসেন খাঁকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল না সাকিনা বিবি।

কিছুক্ষণের ভেতর দেখা গেল নির্জন বালির চরে শুধু দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘদেহী পাঠান আর তার দীর্ঘতর ছায়াটা লুটিয়ে পড়ে আছে চোরাবালির সেই কবরভূমির ওপর।

সাকিনা বিবির কাহিনীতে ছেদ ফেলে দিয়ে অ্যানা কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল দেখে মৈত্রেয়ী বলল, তারপর কি হল দিদি ? হোসেন খাঁ কি ফলমনের সঙ্গে আবার এসে মিলেছিল ?

অ্যানা মৈত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকেই পাল্টা প্রশ্ন করল, কি অনুমান কর তুমি ?

আমি কিছু ভাবতে পারছি না দিদি।

অ্যানা বলল, হাঁ ওদের দেখা হয়েছিল, তবে খেজুরী বন্দরে আব নয়, কয়েক বছর পরে এই সুবর্ণরেখার তীরে।

তারপর ? বিস্মিত মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করল অ্যানাকে।

সেই রাতেই খরস্রোতে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে সে অঞ্চল ছেড়ে চলে এসেছিল হোসেন খাঁ। তারপর এক ঘাটে ভোরের আগেই ডুবিয়ে দিয়েছিল তার নৌকো। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার বর্গী জীবনের অনেক সোনাদানা, টাকা পয়সা। কিন্তু নৌকোখানা জলে ডুবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও কি মনে করে সে নাকি আর ছোঁয়নি। পাপের পয়সা সে জলেতেই বিসর্জন দিয়ে এসেছিল।

তারপর হোসেন খাঁ অনেক পথ পেরিয়ে ফার্গুসন সাহেবের নীল-কুঠিতে লেঠেলদের সর্দারের পদে বহাল হল। এখানে সে নতুন এক জীবনের পত্তন করল।

ইতিমধ্যে ফলমন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভিড়ল এসে ভাগিনাদের দলে। হার্মাদ দস্যুদের বংশধর সে। ভাগিনাদের পুরোনো ফাঁস লাগানোর বিদ্যে ছাড়িয়ে তাদের শেখাল খোলা তলোয়ার আর তীরধনুক নিয়ে দস্যুবৃত্তির কায়দা। এতে উত্তেজনা আছে। পুরুষের মত শক্তি দেখাবার সুযোগ আছে।

কয়েক জায়গায় কিছুদিন ধরে দলবল নিয়ে লুটপাট চালাল ফলমন। কিন্তু মনে যে আগুন জ্বলছিল তার সে আগুন সহজে নিভল না। এক সময় দলের একটি বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে ফলমন বের হল সাকিনা বিবি আর হোসেন খাঁর খোঁজে। সারা বাংলা মুলুকটা তোলপাড় করে ফেলল দুজনে। তারপর একদিন ফার্গুসন সাহেবের নীলকুঠিতে পেয়ে গেল হোসেন খাঁর সন্ধান। ফলমন তখনও ভেবেছিল সাকিনা বিবি জীবিত রয়েছে। সে লোক লাগাল তার আগমনের খবরটা বিবিকে জানিয়ে দেবার জন্যে।

কথাব মাঝে মৈত্রেয়ী আবার প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা দিদি; হোসেন খাঁ চলে আসার পর ফলমন যে দস্যুবৃত্তি শুরু করেছিল, সে কথাটা জানা গেল কি করে ?

হেসে বলল অ্যানা, এও কি আমার অনুমান বলে মনে করলে তুমি ?

না, তা নয়, আমি শুধু জানতে চাইছি।

অ্যানা বলল, যে লোকটি ফলমনের সঙ্গে এসেছিল সে এখন আমারই নীলকুঠির আস্তাবলের তদারকে বহাল হয়ে আছে। তার মুখেই ফল-মনের দস্যুজীবনেব ঘটনাগুলো শোনা। আব তাছাড়া আজও যে নীলকুঠিব মালিক হয়েও ফলমন গোপনে গোপনে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে তার দলবল নিয়ে তাব প্রমাণ তুমি নিজেই।

মৈত্রেয়ী বলল, তোমার কথাব মাঝে বার বাব বাধা দিচ্ছি কিন্তু।

হেসে বলল অ্যানা, মনে প্রশ্ন জাগলে জেনে নেবে বইকি।

যে লোকটিকে উপযুক্ত ভেবে উৎকোচ দিয়ে সাকিনা বিবিব খবব নেবার কাজে লাগাল ফলমন, আসলে সে হোসেন খাঁরই ডান হাত! ভাগ্যের কি কঠিন রসিকতা। হোসেন খাঁ জানল সব। কিন্তু অতি গোপনে রাখল সব ব্যাপারটা। সে ফলমনকে কোনরকমেই জানবার সুযোগ দিল না যে সাকিনা বিবিকে তাব কাছে কেন, ইহলোকের কোথাও কেউ আর খুঁজে পাবে না।

শেষকালে দুই খেলোয়াড় এমনিভাবে কিছুদিন লুকোচুরি খেলল। তারপর এক দুপুরে দেখা গেল একটি পালকি চলেছে ঐ দূরের পাহাড়ের ধারে শাল জঙ্গলের দিকে। সঙ্গে ফলমনের নিযুক্ত করা সেই লোক। হোসেন খাঁ দূর কোন মহালে গেছে বলে ফলমনের কানে খবরটা এনে দিয়েছিল সেই লোকটা। তারপর তারই পরামর্শে ঐ জঙ্গলে সাকিনা বিবির সঙ্গে হয়েছিল ফলমনের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা।

অনেক দিনের পরে সাক্ষাৎ। ফলমন ঘোড়ায় চড়ে সাজপোশাক পরে আগেভাগেই শালজঙ্গলে গিয়ে হাজির হয়েছিল। পালকি নামল জঙ্গলের ভেতর। বাহকেরা সরে গেল আড়ালে। সঙ্গের লোকটা

ফলমনকে সেলাম করে সরে যাচ্ছিল, ফলমন তার দিকে একটা মোহর ছুঁড়ে দিল। লোকটা তাই কুড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল কুর্নিশ করতে করতে।

এরপর আকুল প্রতীক্ষার শেষে প্রণয়িনীর মুখ দেখবে বলে নত হয়ে পালকির দরজা ঈষৎ ফাঁক করে লাফিয়ে উঠল ফলমন। পালকির ওপাশের দরজা দিয়ে ততক্ষণে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে হোসেন খাঁ। হাতে তার তীক্ষ্ণধার তলোয়ার।

ফলমন যদি প্রস্তুত হয়ে যেত তাহলে সেদিন নিশ্চয়ই সে হটে পালিয়ে আসত না। শেষ পর্যন্ত দুই দোস্ত লড়াই করেই সবকিছুর ফয়সালা করে নিত। কিন্তু সে সুযোগ ছিল না ফলমনের। সে গভীর বিশ্বাস বুকে নিয়ে গেছে অনেক দিনের অদেখা প্রিয়াকে দেখবে বলে। কে জানত হৃদয়ের খেলা পরিণত হবে এক তরফা তলোয়ারের খেলায়।

অভাবিত ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কিন্তু ফলমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল না। দস্যুবৃত্তি করবার সময়ে অনেক ঝুঁকি তাকে মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়েছে। বিপদে বিচলিত হলেই যে সবকিছু হারাতে হবে তা ভাল করেই জানত ফলমন। তাই সহসা দিক কাঁপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠে হাতে কয়েকটা তালি মারল ফলমন।

চকিতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল হোসেন খাঁ। সে ভাবল, বুঝি ফলমন এই জঙ্গলের ভেতর তার লুকিয়ে-থাকা সঙ্গীসাথীদের ডাক দিচ্ছে।

হোসেন খাঁর এই সামান্য অন্যমনস্কতাই সেদিন ফলমনকে বাঁচার সুযোগ এনে দিল। সে চোখের পলকে পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা ঘোড়ার উপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

মুহূর্তের অন্যমনস্কতা। হোসেন খাঁর উদ্যত তলোয়ার ঝলসে উঠল। খসে পড়ল পলায়মান ফলমনের ডানহাতের কিছু অংশ। প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলেও ফলমন কিন্তু ঘোড়া থেকে পড়ে গেল না। সে দম বন্ধ করে বুক আর একখানা হাতের সাহায্যে মিশে রইল ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে। বিদ্যুৎ বেগে ফলমনের ঘোড়া আরোহীকে

নিয়ে শাল জঙ্গল পেছনে ফেলে গ্রীষ্মের আগুন-ঝরা ফাঁকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে পড়ল সুবর্ণরেখার জলে।

থামল অ্যানা। তারপর মৈত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, এর পরের সব কাহিনীই তোমার জানা হয়ে গেছে।

মৈত্রেয়ী বলল, আশ্চর্য! ফলমন হাতখানা হারিয়েও কিন্তু তার দস্যুবৃত্তি হারাল না!

অ্যানা বলল, হাত হারিয়ে সে আরও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। তার ওপর এখন সে নিজেই নীলকুঠির মালিক। দস্যুতার চিহ্নগুলো মুছে ফেলা তার পক্ষে অনেক সহজ।

এবার অন্য কথা পাড়ল মৈত্রেয়ী, আচ্ছা দিদি, ঐ মানুষটাকেই নাকি একদিন তুমি অনেক কাছে পেয়েছিলে। সে কি করে সম্ভব হল?

আমি ওর বাজী জেতার বীরত্বে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার ওপর ওর হাতখানা হারিয়ে ও আমার মনের করুণা কেড়ে নিয়েছিল। এই দুদিক থেকেই ও আমার মনটাকে সাময়িকভাবে ওর দিকে টানাব সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।

এবার কপট কৌতুকে প্রশ্ন করে বসল মৈত্রেয়ী, আপত্তি না থাকলে বলবে কি, কতদূরই বা তুমি গিয়েছিলে ফলমন সাহেবের সঙ্গে, আর কোথা থেকেই বা ফিরতে হয়েছিল তোমাকে?

মৈত্রেয়ীর কৌতুক-প্রশ্নে হাসির তরঙ্গ তুলল অ্যানা।

হাসি থামলে বলল, প্রায় ঐ সুবর্ণরেখার জলে ডুবতেই বসেছিলাম, শেষে একটা ঢেউ এসে আমাকে কূলে তুলে দিয়ে গেল।

অ্যানার হাত দুটো ধরে বলল মৈত্রেয়ী, হেঁয়ালী রাখ দিদি, আসল কথায় এসো। জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে।

এসব কথা শুনতে খুব আমোদ হয়, তাই না মেরী?—কৌতুকের হাসি অ্যানার মুখে।

গম্ভীর হয়ে গেল মৈত্রেয়ী। অ্যানার হাতখানা তার তেমনি করেই ধরা রইল। তারপর কোথা থেকে বিনা মেঘে অ্যানার হাতে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে মৈত্রেয়ীকে প্রায় জড়িয়ে ধরল অ্যানা।

তুমি মনে মনে এমন দুর্বল মেরী! সামান্য কৌতুককে তুমি কান্নায় ভাসিয়ে দিলে। তুমি জান আঘাত দেবার জন্যে তোমাকে আমি কোন কথাই বলি না কোনদিন। নিছক রসিকতাকে এমন করে আজ গায়ে মেখে নিচ্ছ কেন মেরী?

মৈত্রেয়ী চোখ মুছে মাথা নাড়ল। সে বোঝাতে চাইল যে অ্যানার কথায় আহত হয়নি সে।

কিন্তু অ্যানা বুঝল, ব্যথার উৎসটা মৈত্রেয়ীর কোথায়। যার জীবন থেকে প্রেম নিষ্ঠুরভাবে নির্বাসিত হয়েছে, সেই শূন্য প্রেমের প্রকোষ্ঠের দরজায় সে না বুঝে নাড়া দিয়ে ভাল করেনি।

একটু পরেই সহজ হয়ে এল সব। মৈত্রেয়ীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

অ্যানা বলল, এখনও কি আমার আর ফলমনের ঘনিষ্ঠতার কাহিনী শুনতে তোমার ইচ্ছে করবে?

মৈত্রেয়ী কোন কথা না বলে হেসে মাথা নাড়ল।

তবে শোন। অ্যানা শুরু করল, সেবা যত্নে ওকে আমি সুস্থ করে তুলেছিলাম। তাই আমার ওপর ওর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

ও যখন ওর হাতখানা হারিয়েও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল তখন আমি ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। ওকে নিয়ে আমি আমাদের বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। হাসি কৌতুকে ভুলিয়ে দিতে চাইতাম ওর দুঃখ।

একদিন পড়ন্ত বিকেলের রদ্দুরটা ভারি মিষ্টি লাগছিল। আমি কুঠির ঐ গোলগম্বুজের ভেতরে বসে তাকাচ্ছিলাম এদিক ওদিক। হঠাৎ নজর পড়ল বাগানের দিকে।

একটি শ্বেত পাথরের বসবার বেদীর ওপর আধশোয়া অবস্থায় বসে রয়েছে ফলমন। বাঁ হাতখানা গালে দিয়ে যেন চিন্তার রাজ্যে ডুব দিয়েছে। বেদীর চারদিকে লতানে গাছের কুঞ্জ। বাইরের থেকে, এমনকি কুঠির আর কোন জানালার পথে বাগানের ঐ কুঞ্জের

ভেতরকার দৃশ্য চোখে পড়ে না, শুধু, ঐ গম্বুজের একটি মাত্র উঁচু গবাক্ষ দিয়ে ঐ জায়গাটা দেখা যায়।

তখন রদ্দুরের শেষ সোনাটুকু ঝরে পড়ছিল দিগন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর ওপর। সুবর্ণরেখার জল যেন গলিত সোনার প্রবাহ। গাছে গাছে প্রান্তরে প্রান্তরে শুধু ঝরে-পড়া সোনার খেলা! ঐ সোনা ঝরছিল আর এক জায়গায়, সেখানে একান্ত নিভৃতে চিন্তার অতলে ডুব দিয়েছিল, একটি মানুষ। সে জানত না, বিধাতা তারই অজ্ঞাতে তার ঐ সোনাঝরা দেহেব ওপব অদূরবাসিনী একটি মেয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে।

সেই মুহূর্তটা কেন জানি না আমাব মনে হল ভালবাসার। ঐ অঙ্গহীন মানুষটার সকল দুঃখ দূর করে দেবার জন্যে মনে হল যেন আমি জন্মেছি। আমি সেদিন সেই নিঃসঙ্গ মানুষটিকে সঙ্গ দেবাব জন্যে ঐ গোলগম্বুজের সিঁড়ি বেয়ে নাচে নেমে গেলাম।

আমাকে সে সময় সেখানে দেখতে পাবে ফলমন তা ভাবতে পারেনি। সাধারণতঃ সকালেব দিকেই আমরা বেড়িয়ে বেড়াতাম। কিন্তু বিকেলের দিকে আমাব সাংসারিক কতকগুলি করণীয় ছিল। তাই সে সময় বড় একটা আমি কুঠির বাইবে বের হতাম না।

সেদিন সব কাজ আমাব তোলা রইল। আসন্ন সন্ধ্যায় আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সেই কুঞ্জের মাঝখানে।

ও যেন, মনে হল আমাকে সহসা সেখানে দেখে বিব্রত হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি একখানা হাত বেদীর ওপর ঠেকিয়ে ও কষ্টে উঠে বসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে আবার গড়িয়ে পড়ল। আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বেদীতে তুলে বসালাম। ও তখন অপ্রস্তুতের ম্লান একটা হাসি হাসছিল। আমার কিন্তু চোখ তখন শুকনো ছিল না। আমি অন্যদিকে ফিরে আমার মনের ভাব গোপন করলাম।

প্রখর বুদ্ধি ফলমনের। আমার সে সময়ের মনের ভাবটুকু সে বুঝে নিল। তাকে কাজে লাগাবার সুযোগটুকু সে হারাতে চাইল না।

ম্লান হেসে বলল, অসহায়ের ওপর অশেষ করুণা আপনার মিস হেপবার্ন। আপনার দয়া আমাকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে।

একটু থেমে যেন গভীর একটা দুঃখ বুকে চেপে বলল, কি হবে মিস. হেপবার্ন এই অক্ষম মানুষটার ঋণের ভার বাড়িয়ে ?

আমি তখন একটি অসহায় মানুষকেই শুধু ওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর স্বভাব-ছলনাময় চরিত্র তখনও আমার কাছে ছিল অজ্ঞাত।

আমি বললাম, বিচলিত হবেন না। এ সময় আপনাকে যেটুকু সাহায্য করতে পারছি সেটুকুতে আমার নিজেরই তৃপ্তি। আপনি সুযোগ না দিলে এ তৃপ্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হত।

হঠাৎ ও আমার একখানা হাত ওর বাঁ হাতখানায় তুলে ধরে চুম্বন করল। তারপর ওর বুকে চেপে ধরে রইল কতক্ষণ।

আমি ওর তখনকার মনের উত্তাপটুকুর পরিচয় পাচ্ছিলাম। আমার মনও তখন ওর প্রতি বিরূপ ছিল না। আমি আমার হাত ওর কাছ থেকে সহসা টেনে নিলাম না। যেমন বসে ছিলাম তেমনি বসে রইলাম। এইভাবে কিছু সময় কেটে যাবার পর আমাদের বাগানের বড় বড় গাছ-পালা আর লতাগুল্মের ওপর থেকে সূর্যের শেষ সোনাটুকু মুছে গেল। ছায়া নেমে আসতে লাগল নীরবে। ফলমন এই ছায়ার মায়ায় সেদিন আমাকে বেঁধে ফেলতে চাইল।

ওর নগ্ন একটা প্রস্তাবে আমি একটু চমকেই উঠেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবেছিলাম, ও-দিন আমার দিক থেকেই ও প্রশ্রয় পেয়েছিল।

তুমি হয়ত ভাববে মেরী আমি নিজেকে পবিত্র বলে জাহির করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস কর আমি সেদিন ফলমনের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রস্তাবে সাড়া দিইনি।

আজ সেদিনের কথা যতই ভাবি নিজের ওপর শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। একবার ভেবে দেখ, আমাদের সমাজে মেলামেশার ব্যাপারে আমরা কত স্বাধীন। তারপর সেদিন প্রকৃতি আমাদের দুজনকে তার সন্ধ্যার

ছায়া-গুণ্ঠনে আড়াল করে রেখেছিল। আমি তখন দেহে মনে নতুন জেগে-ওঠা তারুণ্যের স্পর্শে কাতর। চারিদিকের এই যোগাযোগ। সামনে আমার সঙ্গলোভী এক বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ বসে রয়েছে। তার সকাতর আহ্বানে আমার দেহে মনে উচ্ছ্বসিত জোয়ারের প্লাবন বয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু সেদিন কোথা থেকে মনের এক প্রবল শক্তি আমার মধ্যে জেগে উঠল। আমি নিজেকে কোনরকমেই নিঃশেষে হারিয়ে যেতে দিলাম না।

ওব প্রস্তাব যেন আমি শুনতেই পাইনি, এমনি ভাবলেশহীন মুখে ওকে বললাম, আপনি সবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ওদিকে তাকিয়ে দেখুন শিশির পড়তে শুরু করেছে, এখন বোধহয় এখানে আর আপনার বসে থাকা উচিত হবে না।

অদম্য একটা কামনাব পথ সহসা রুদ্ধ হয়ে গেলে মানুষ যেমন আক্ষেপে ভেঙে পড়ে তেমনি হল ফলমনের অবস্থা। সে তার বাঁ হাতখানা আবার গালে ঠেকিয়ে চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেল।

এখন মনে হচ্ছে, ধূর্ত ফলমন সেদিন এমনি এক হতাশ প্রেমিকের অভিনয় করে আমার সহানুভূতিকে কেড়ে নেবাব চেষ্টা করছিল। সে ভাল করেই জানত, একবার আমাকে তার কামনার জালে জড়াতে পারলে, শেষের বাজীটুকু জিততে তার অসুবিধে হবে না। হেপবার্নদের জমিদারির সেই হবে তখন একচ্ছত্র মালিক।

কিন্তু সেদিন কোন বকমেই তার সে ইচ্ছার পূরণ হল না। সে যে ধরনের দুর্বৃত্ত ছিল তাতে সেই সন্ধ্যার সুযোগে সে আমার ওপর বলপ্রয়োগ করতে পারত। তারপর তার চলে যাবার হাজারো দ্বার সে খোলা পেত। কিন্তু তা সে করল না। সে একবারমাত্র তার শিকারের শক্তির সীমা পরীক্ষা করে ছেড়ে দিল। সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় বারে বারে এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিল ফলমন। সামান্য একটা উত্তেজনায় অসামান্য আখের নষ্ট করার সে পক্ষপাতী ছিল না। তাই আমার সেদিনের কথা সে বাধ্য ছেলের মত মেনে নিয়ে আমার হাত ধরে উঠে এলো কুঠিতে। আজ ভাবি, ফলমন সেদিন আমার চেয়েও

টাকারই প্রত্যাশী ছিল বেশী। আমি পরে বিভিন্ন সূত্রে তার জীবনের যতটুকু খবর পেয়েছিলাম তাতে জেনেছিলাম, নারী তার কাছে ছিল শুধু দেহের ভোগ চরিতার্থ করার সামগ্রী। অর্থকেই সে জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলে মনে করত। ভালবাসা তার কাছে ছিল নিছক ভোগ, আর অর্থ ছিল জীবনের চরম লক্ষ্য।

ফলমনকে সেদিন ঘরে নিয়ে এলাম। মানুষটার দিকে তাকিয়ে মনে হল, কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেছে।

ওকি তাহলে ভাবছে যে, ওর জঘন্য প্রস্তাবের কথা আমি বাবার কানে তুলব আর সেজন্যে এই অসহায় অবস্থায় ওকে আমাদের কুঠি ছেড়ে চলে যেতে হবে! আমি আবার ওর ওপর করুণা বোধ করতে লাগলাম। সেদিন ওকে আর কিছু না বলে বাবার কাছে ওর একটা কাজের জন্য সেই রাতেই সুপারিশ করলাম।

আমার ইচ্ছাকে বাবা ছোটবেলা থেকেই খুব মর্যাদা দিতেন। তিনি পরদিন ফলমনকে ডেকে কুঠির কাজে নিযুক্ত করলেন। ফলমন হয়ত আশা করেছিল কঠিন কোন তিরস্কার কিন্তু তার বদলে তার হাতে এলো অভাবিত এক পুরস্কার। সে নিশ্চয়ই মনে মনে অনুমান করেছিল তার এই সৌভাগ্যের প্রথম সোপানটি আমিই তৈরি করে দিয়েছি।

আশেপাশে যে সব জমিদার, ব্যাবসাদার আছেন তাঁদের সঙ্গে নীলকুঠির মালিকদের নানা কারণে বিবাদ বিসংবাদ লেগেই থাকে। এজন্যে কোর্টে বিচারের কাজে ছুটতে হয় প্রায়ই। বাবা একাই দেখতেন এতবড় জমিদারির কাজ। তিনি একজন বিচক্ষণ সাহায্যকারী চাইছিলেন মনে মনে। ফলমনকে পরীক্ষামূলকভাবে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর ফলমন। তাছাড়া দেশীয় গোমস্তারা একদিকে, আর ফলমন আমাদের দিকে, তাই বিচারকের রায় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অনুকূলেই আসতে লাগল। বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এতদিন একাই যুদ্ধ করে যে বিশাল সম্পত্তি তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তাকে শান্তিতে ভোগ করার সুযোগ তিনি একদিনও পাননি, এবার যেন ফলমনের হাতে দায়িত্ব তুলে দিতে পেরে জীবনে অনেক নিশ্চিন্ত হলেন।

ফলমন অচিরে আমাদের নীলকুঠির ম্যানেজাব হয়ে গেল। বাবা এবাব আরামের মাঝে ডুব দিলেন। এই সময়ে একটি ভদ্রমহিলা বাবার অবসর জীবনে উদিত হলেন। আমি প্রথম প্রথম একটু দুঃখ পেতাম, কিন্তু বাবার এমন অকৃত্রিম আর অগাধ স্নেহ আমার ওপর ছিল যে আমি বাবাকে কোন রকমেই অপরাধী ভাবতে পারতাম না। আর তাছাড়া, মেরী তুমি দেখতেই পাচ্ছ, সামান্য কিছু অর্থ ছাড়া বাবা এতবড় জমিদারির কিছুই নিজেব জন্যে নিলেন না; দেশে ফেবাব আগে সবটুকুই তুলে দিয়ে গেলেন আমার হাতে।

ফলমন বাবাকে যাদু কবে ফেলেছিল। একে একে তাঁর হাত থেকে সবটুকু ভার নিজের হাতে তুলে নিল। আমি সে সময় বাবার এসব পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম ঠিকই কিন্তু এতদিন যে মানুষটি কঠোর শ্রম করে একেবাবে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তাঁব বিশ্রামেব কোন ব্যাঘাত আমি ঘটাতে চাইলাম না।

যা আমার বাবা কোনদিনই করেননি এবং যে কারণে তিনি প্রজাদের প্রিয় আর অন্যান্য কুঠিয়ালদের অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, সেই কারণের মূলে কুঠাবাঘাত করল ফলমন। তার মত হল, জমিদার আর প্রজার বিরোধ জিইয়ে রাখতে হয়। লাঠালাঠি, খুনোখুনি না হলে শরীরে বাত ধরে যায়, মানুষ অলস হয়ে পড়ে। উত্তেজনাই মানুষের মধ্যে সঞ্চার করে প্রাণ।

মাঝে মাঝে ফলমনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রজারা আসত আমার কাছে। কেঁদে কেটে শোনাত তাদের দুঃখ আর নির্যাতনের কাহিনী। আমি তাদের মৌখিক সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, এবার বাবা ফিরে এলে নিশ্চয়ই তাদের একটা ভাল কিছু ব্যবস্থা হবে। বাবার ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তাদের ধৈর্য ধরে থাকতে বলতাম। এদিকে নায়েবমশায় প্রজাদের দুঃখের কিছু কিছু কাহিনী বাবাকে চিঠির মাধ্যমে জানালেও, আমি কোন খবরই বাবাকে দিতে চাইতাম না। আমি ভাবতাম, দূরে যে মানুষ বিশ্রামের জন্যে গিয়েছেন তাঁর বিশ্রামকে কোন কারণেই বিঘ্নিত করা ঠিক নয়। তাছাড়া তিনি নিজে

এসে স্বচক্ষে সব দেখে কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন, মনে মনে এইটাই আমি চাইতাম।

যখন ফলমনের এমনি দৌরাত্ম্য চলছিল তখন একদিন একটি ঘটনা ঘটল। সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি বাগানে পায়চারি করছিলাম। বাবা দূরে গেলে আমার হাতের কাজ কমে যায়, তখন সারা বিকেল আমি একা একা ঘুরে বেড়াই বাগানে। সেদিনও এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমাদের বাগানের দীর্ঘ ঝাউগাছগুলো উত্তুরে বাতাসের সঙ্গে কথা কইছিল। আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এক ঝাঁক পাখি। আমি তাদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো। কে যেন আমার আশে পাশে কোথায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার দৃষ্টি তখন আকাশে ভাসমান পাখিদের থেকে এসে পড়ল বাগানের ভেতর। আমি আবছা সন্ধ্যায় সেই কান্নার শব্দটুকু সন্ধান করতে লাগলাম।

বেশী খুঁজতে হল না। নদীর দিকে যে সব গাছপালা জটলা করে দাঁড়িয়েছিল, তারই আড়াল থেকে ভেসে আসছিল একটা চাপা কান্নার স্বর। জায়গাটা আমার কাছ থেকে বেশী দূরে ছিল না। আমি ওদিকে এগোতে লাগলাম। মনে হল মিহি গলায় আট দশ বছরের একটি মেয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। কাছে গেলাম।

একটা গাছে হেলান দিয়ে মেয়েটি কাঁদছিল। কাছে যেতেই তার কান্না থেমে গেল। সংকোচ আর ভয় মেশান চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি সেই সন্ধ্যার আবছায়ায় তার করুণ বিষণ্ণ মুখখানা ঠিকই দেখতে পাচ্ছিলাম।

কে তুমি ? কাঁদছই বা কেন ?

মনে হল ও আমার কথার ঠিকমত জবাব দিতে ভয় পাচ্ছিল। তাই ওর একেবারে কাছটিতে সরে গিয়ে বললাম, ভয় কি, কোথায় থাক তুমি ?

মেয়েটি একটা বিশেষ দিকে আঙুল তুলে দেখাল। বুঝলাম, ওটা আমাদেরই জমিদারির একটা অংশ।

এবার বল, তুমি সন্ধ্যেবেলা এই বাগানের ভেতর দাঁড়িয়ে এমন করে কাঁদছই বা কেন ?

আমাব গলার স্বরে ও বোধকরি একটা কোমল মমতার আঁচ পেয়ে থাকবে। হঠাৎ দৌড়ে এসে ও আমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল।

আরে কি করছ, কি কবছ, বলে ওকে তুলে ধরতে গিয়ে কি আর ওঠাতে পারি ! আমাব দুটো পা তখন মেয়েটি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ওর চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

একবকম জোর করেই ওকে তুলে পাশে দাঁড় করালাম।

কি হয়েছে বল আমাকে, শুধু কেঁদে ত কোন ফল হবে না ?

ও চোখ মুছল। তাবপব আমার দিকে ওর ভীরু চোখ দুটি তুলে বলল, আমার মাকে আটক কবে বাখা হয়েছে মেমসাহেব।

তোমার মাকে ! কে বেখেছে, কোথায়ই বা রেখেছে ?

আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও আমি জানি, যে-কোন নীলকুঠিতেই মেয়ে পুরুষ নির্বিচারে আটক করে রেখে অনেক সময় কাজ আদায়ের জন্যে অত্যাচার করা হয়, তবু আমাদের নীলকুঠি এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিল।

ও বলল, কাল রাতে ফলমন সাহেব আমাদের গাঁ থেকে মাকে এই কুঠিতে ধরে এনেছে মেমসাহেব।

এই কুঠিতে ! অসম্ভব !—বললাম, তুমি ভুল করনি ত ?

ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে বলল, আমি যে এখুনি মাকে দেখে আসনু মেমসাহেব !

কুঠিতে দেখে এলে তোমার মাকে ?—প্রায় অবিশ্বাসের সুবে জোর গলায় কথাটা বললাম।

ও চুপ করে গেল। মাথাটা নীচু করে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

বল, ঠিক করে বল, কোথায় দেখেছ তোমার মাকে ? আমাব কুঠিতে বাইবের কোন লোককেই রেখে দেবার নিয়ম নেই।

ও বলল, ঐ বড় কুঠি বাড়ীতে নয় মেমসাহেব। এই বাগানের ধারে ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে যে নীল রাখার ঘর, ঐ ঘরের ভেতর।

আমার সমস্ত শরীর ক্রোধে ঘৃণায় কাঁপতে লাগল। আমি ওর হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে সেদিকে নিয়ে চললাম।

কাছে পৌঁছতেই ছায়ার মত একটা লোককে সরে যেতে দেখলাম।

কে, কেও ? যেও না, দাঁড়াও।

লোকটা একটু দূরেই থমকে দাঁড়াল।

কাছে গিয়ে দেখলাম আমাদের নীলকুঠিরই একজন পেয়াদা।

কি করছিলে তুমি এখানে ? গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলাম।

কিছু না মেমসাব, এই একটুখানি আস্তাবলের দিকে এসেছিলাম।

ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলাম, আমার কাছে মিথ্যে বলে পার পাবে না। ঠিক করে বল কি করছিলে এখানে ?

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম লোকটা থর থর করে কাঁপছে।

ভাঙা গলায় বলল, সাহেব এখানে এই ঘরখানার পাহারায় বসিয়ে রেখে গেছেন আমাকে।

খোল দরজা।

লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। তারপর হাত জোড় করে বলল, আমার অপরাধ নেবেন না মেমসাব, সাহেবের হুকুমই আমি তামিল করছিলাম।

বাতি জ্বালাও।

একটা মোমবাতি জ্বালল সেই লোকটা।

তখন অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছিল ঘরের ভেতর। বাতি জ্বালতেই ঘরের কোণায় দেখা গেল একটি স্ত্রীলোক জড়োসড়ো হয়ে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

কাছে যেতেই কেমন যেন আর্তনাদ করে উঠল সে। মনে হল স্ত্রীলোকটি ভাবনা আর ভয়ে তার স্বাভাবিক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ আমার যেন কেমন সন্দেহ হল। ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম লোকটাকে। ধমক দিয়েই বললাম, ফলমন সাহেব কখন এসেছিল এখানে ?

তেমনি কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, কিছু আগে মেমসাব।

আমি সেখান থেকে লোকটাকে চলে যেতে বললাম।

পেয়াদাটা মাথা নীচু করে পালিয়ে বাঁচল।

মেয়েটি তার মাকে বোধকরি বাইরে থেকে একটুখানি দেখে থাকবে। এখন আলোয় মায়ের অবস্থা দেখে সে যেন অবুঝ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, আলোটা তুলে ধর, এমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

মেয়েটি এবার এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে আলোটা নিয়ে মায়ের দিকে তুলে ধরল। আমি মহিলাটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বিবাহিতা। এমন স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না।

তার কাছে যেতেই সে আর্ত চীৎকারে ফেটে পড়ল, দুটি পায়ে পড়ি সাহেব, আগে আমাকে মেরে ফেল। আমি আর বাঁচতে চাই না সাহেব, বাঁচতে চাই না।

ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

আমি শুনতে পেলাম, আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট মেয়েটিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মহিলাটির কাছে গিয়ে বললাম, চেয়ে দেখ আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি। ঐ দেখ, তোমার মেয়েও এসেছে।

প্রথমে কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টি মেলে তাকাল মহিলাটি। দেখলাম তার দুটো চোখেই সিঁদুরের আভা। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তারপর মেয়েটির দিকে তাকাল। দেখলাম, তার চোখে জল নেমে এলো অঝোরে।

এবার এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখতেই ও আমার পায়ের ওপর মাথা কুটতে লাগল।

আমি ওকে জোর করে ধরে তুললাম। তারপর প্রায় জড়িয়ে ধরে এগোতে লাগলাম কুঠির দিকে। ও স্খলিত পায়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে

চলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ওকে এনে তুললাম আমার ওপরের ঘরে।

সেবা শুশ্রূষায় রাতের মধ্যেই মহিলাটি সুস্থ হয়ে উঠল। ছোট মেয়েটিকে কাছে পেয়েই সে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। মহিলার মুখ থেকেই ঘটনাটা শুনতে পেলাম।

ক'দিন হল সে এসেছিল তার বাপের বাড়ী কলমদান গাঁয়ে। শ্বশুর বাড়ী কয়েকখানা গাঁয়ের ওপারে। স্বামী করে নীলের চাষ। ওটা ফাগুর্সন সাহেবের এলাকা। খোদ সাহেবই নাকি একদিন ওর স্বামীকে ডেকে অনেক টাকা সাহায্য বাবদ দিয়ে দিলেন। স্বামী ত মহা খুশী। কিন্তু ওর নাকি ব্যাপারটা খুব ভাল লাগল না।

যা ভেবেছিল তাই। পরের দিন থেকে তার ঘরের মানুষ কাজে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফাগুর্সনের সরকার এসে হাজির হতে লাগল। ছোট বড় নানা ধরনের বায়নাক্কা। শেষে ফাগুর্সন সাহেবের খাস কামরায় একদিন পড়ল তার নিমন্ত্রণ।

যে রাতে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে ডুলি আসবার কথা, সেই রাতেই মেয়ের হাত ধরে সে পালিয়ে এল বাপের বাড়ী।

মেয়েটি বলল, কলমদান গাঁ হেপবার্ন সাহেবের এলাকায়। তাই বাবার কাছে এসে নিশ্চিন্ত ছিলাম। আর যা হোক, আপনার রাজ্যে মেয়েদের মান যায় না একথা দুনিয়ার লোকে জানে। কিন্তু কটা দিন যেতে না যেতেই আমার সে ভুল ভেঙে যেতে লাগল। বুঝতে পারলাম, সব বনেই জন্তু থাকে মেমসাহেব।

আপনাদের এই এলাকায় আমি আমার এই মেয়ের মত বয়েসে কত খেলাধুলো করে বেড়িয়েছি। আপনাদের ঐ সামনের মাঠ থেকে কত পলাশ ফুল পেড়ে নিয়ে গেছি বসন্তের দিনে। সেদিন ত কোন ভয় ছিল না।

একটু থেমে মেয়েটি বলল, একদিনের একটি ছোট ঘটনা আজও ভুলতে পারিনি মেমসাহেব। তখন আমরা গাঁয়ের কটি ছেলে-মেয়ে মিলে এসেছিলাম আপনাদের ঐ পলাশ ডাঙায়।

সারাটা বিকেল যত ফুল পেড়েছি, ডাল ভেঙেছি তার চেয়েও বেশী। ছেলেরা আছে গাছের ওপর, আমরা কুড়োচ্ছি ফুল। এমন সময় লাঠি হাতে দৌড়ে এল আপনাদের কুঠির দরোয়ান। তার মার মার্ শব্দে আমাদের তখন প্রাণ উড়ে গেছে। আমরা হয়ত দৌড়ে পালাতে পারতাম, কিন্তু গাছের ওপর তখনও ছেলেরা রয়েছে। তাদের ফেলে কি করে পালাই। যেখানে ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়েই কান্না জুড়ে দিলাম।

হঠাৎ দেখলাম, ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন আপনার বাবা ওডেন সাহেব, সঙ্গে আর একটা ঘোড়ায় রয়েছেন আপনার মা। বোধহয় রোজকার মত নদীর তীরে বেড়াবার জন্যে বেরিয়েছিলেন।

ওঁদের আসতে দেখে আমরা ভাবলাম আর রক্ষে নেই, এখুনি হয়ত আমাদের ধরে নিয়ে যাবে কুঠিতে। তাই আমরা ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলাম।

ওঁদের দেখে দরোয়ানের হাঁকডাক আরও একটু বেড়ে গিয়েছিল। সাহেব আর মেমসাহেব কাছে এসে আমাদের কান্নাকাটি করতে বারণ করলেন। গাছ থেকে ছেলেদের নেমে আসতে বললেন। ওরা ভয়ে ভয়ে নেমে এল। আমরা ভাবলাম, এইবার বুঝি সাহেব সব কটিকে এক সঙ্গে বেঁধে ফেলার আদেশ দেবেন দরোয়ানকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, তা হল না। সাহেব দরোয়ানকে আদেশ করলেন গাছে উঠে আমাদের ফুল পেড়ে দিতে। দরোয়ান কি করে অগত্যা তাকে লাঠিখানা মাটিতে নামিয়ে অনেক কসরৎ করে গাছে উঠতে হল। বেচারার বোধহয় গাছে ওঠার ভাল অভ্যেস ছিল না কিন্তু সাহেব পাছে তাকে অপদার্থ ভেবে বসেন তাই তার গা, হাত, পা কেটে ছড়ে গেলেও সে আমাদের ফুল পেড়ে দিতে লাগল। আমরা তখন সাহস পেয়ে গেছি। হুটোপুটি করে ফুল কুড়োতে লাগলাম। মেমসাহেব ঘোড়া থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে ফুল কুড়োনর খেলায় মাতলেন। শেষে সব কটি ফুলই আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, রোজ তোমরা এই মাঠে খেলা কোরো কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

এরপর প্রায় রোজই আমরা ঐ সামনের মাঠে খেলার আসর পাততাম। ফুল ছেঁড়া ডাল ভাঙা ত তার সঙ্গে আছেই। দরোয়ানকে মাঝে মাঝে দেখতাম দূর থেকে তাকাচ্ছে। আমরা কিন্তু ওকে আর ভয় পেতাম না। ও আমাদের কাছেপিঠে আসত না। হয়ত ওর ভয় ছিল আবার কখন ওকে গাছে ওঠার ধকল পোহাতে হয়!

মেয়েটি কথা বলতে বলতে থেমে গেল। বোধহয় সে তার অতীত শৈশব জীবনের স্মৃতিটুকু মনে মনে স্মরণ করছিল।

আমার চোখও তখন শুকনো ছিল না। আমি আমার হারানো মায়ের ফুল কুড়োনোর ছবিটাই দেখতে পাচ্ছিলাম।

এক সময় ম্লান হেসে ও বলল, মেমসাহেব, সেই ওড়েন সাহেবের কুঠিতেই আমাকে বন্দী হয়ে আসতে হল।

ফলমন সাহেবের নজর আমি এড়াতে পারলাম না। কলমদানের ঝিলে পদ্ম তুলতে গিয়ে আমার কাল হল। আপনার কুঠির লোক আমার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে ডুলিতে করে তুলে আনল। মেয়েটা বোধহয় দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিল, তাই খবরটা দিতে পেরেছিল আপনাকে। কিন্তু আর খানিক আগে এলেন না কেন মেমসাহেব, তাহলে আমাকে সাহেবের অপমানের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই দিতে পারতেন।

কথা ক'টি বলেই মেয়েটি অঝোরে কাঁদতে লাগল।

তাকে আমি নানাভাবে সান্ত্বনা দিলাম। সে আমার আশ্রয়ে খুব আশ্বস্ত বোধ করতে লাগল।

আমি বললাম, তোমার রূপই হয়েছে তোমার কাল।

ও বলল, যদি বিধাতা রূপ দিল মেমসাহেব, তবে বড় ঘরে জন্ম দিল না কেন?

বললাম, পদ্ম তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছিলে না তুমি? তোমার কথার জবাব আছে ওতেই। পদ্ম জন্মায় পাঁকে, কিন্তু ভোগে লাগে বড় ঘরের উৎসবে।

ও চুপ করে গেল।

বললাম, সে কথা যাক্, এখন তুমি কি চাও বল ? তোমার বাবাব কাছে ফিরে যেতে পাব, অথবা যতদিন খুশি থাকতে পার এখানে।

মেয়েটি মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল।

এক সময় বলল, আমি স্বামীর কাছেই ফিবে যাব মনে কবছি মেমসাহেব।

বিস্মিত হয়ে বললাম, স্বামীর কাছে! সেই ফার্গুসনের এলাকায় ?

ম্লান হেসে বলল মেয়েটি, হাঁ মেমসাহেব। মেয়ে মানুষের মান যখন কোথাও রক্ষা পাবে না, তখন স্বামীর কাছে থাকাই ভাল। মান রাখার জন্যে স্বামীকে ছাড়া চলতে পারে কিন্তু স্বামী ছেড়ে এসে মান খোয়ান যায় না।

বললাম, তোমার যেখানে খুশি তুমি যেতে পার, শুধু একটা কথা বলতে পারি তোমাকে, আজ থেকে আমাদের এলাকায় কেউ তোমার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না।

আমি ওর বুড়ো বাবাকে ডেকে পাঠালাম। মেয়ের জন্যে লোকটি খুব দুঃখ প্রকাশ করল, কিন্তু সঙ্গে আর নিয়ে যেতে চাইল না।

মেয়েটির ইচ্ছা মত আমি তাদের দুজনকে লোক দিয়ে ফার্গুসনের এলাকায় তার স্বামীর কাছে পাঠিযে দিলাম।

এরপরে আরও একটুখানি ঘটনা আছে শোন।

কিছুকাল আগে আমি ঘোড়ায় চড়ে আমাদের ঐ পলাশ ডাঙার মাঠে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম পথের ওপর একটি অন্ধ স্ত্রী-লোকের হাত ধরে নিয়ে চলেছে আর একটি বছর পনের ষোল বয়সের মেয়ে।

কাছাকাছি এসে তরুণী মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। তারপর হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করল।

আমি প্রথমে ওকে চিনতে পারিনি। তারপর মনে পড়ে গেল ওর কিশোরী-মুখখানা।

বললাম, কোথায় গিয়েছিলে ?

মেয়েটি বলল, মাকে নিয়ে ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম মেমসাহেব।

আমি চমকে উঠলাম। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, এ তোমার মা।

আমি দেখলাম আগুনে পোড়া, বিকৃত অন্ধ একটা স্ত্রীলোক।

ঐ অন্ধ মেয়েটি হাসল। কি বীভৎস সে হাসি! বলল, আমি আমার রূপকে পুড়িয়ে ফেলেছি মেমসাহেব। এখন বলুন তো দেখি আমার গায়ে হাত তুলতে আর কারো সাহস হবে?

সে হাসতে লাগল, আর আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

স্ত্রীলোকটির মুখ থেকে শুনলাম, অপমানের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মরতে চেয়েছিল সে। মরা হয়ে ওঠেনি, কিন্তু বেঁচে গেছে জন্মের মত।

মনে হল, জগতে সুন্দরের চেয়ে কুৎসিত কত সুখী, কত নিরাপদ।

আমার হাতের একটি দামী আংটি খুলে ওর হাতে দিতে গিয়ে বললাম, তোমার মেয়ের বিয়ের সময় এই আংটিটা দিও ওকে। ওর হাতে বেশ মানাবে।

ও পেছিয়ে গিয়ে বারবার নমস্কার করে বলল, আপনার দয়ার কথা ভুলতে পারব না মেমসাহেব, তবে আপনার আংটিখানা আমি নিতে পারব না। কামনা করুন, যেন মান খোয়াবার আগে ও আমার মত ওর রূপটাকে আগুনে ঝলসে নিতে পারে।

আমার চোখের সামনে থেকে মা আর মেয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল। কতক্ষণ পরে মৈত্রেয়ী বলল, তুমি মেয়েটিকে ফলমনের হাত থেকে যখন উদ্ধার করে এনেছিলে, তখন ফলমনের সঙ্গে এ নিয়ে তোমার কোন কথা হয়নি দিদি?

হয়েছিল, তবে কথার শুরু আমি করিনি, জানতাম ওই করবে। কারণ বাঘের মুখ থেকে যে শিকার কেড়ে নিতে যায়, তার ওপরেই বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

একটু থেমে আকাশের দিকে তাকাল অ্যানা। নির্মল আকাশে

নক্ষত্রগুলো জ্বল জ্বল করছে। মাঝে মধ্যমণি হয়ে চাঁদ রূপোর ভৃঙ্গার থেকে যেন দুধ ঝরিয়ে দিচ্ছে চরাচরে।

কথা শুরু হল।

সেদিন আকাশের রূপ ঠিক এমনটি ছিল না। শীতের আকাশ থেকে আলো পাঠাতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল চাঁদ। আমিও মনের দিক থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মেয়েটি চলে যাবার পর নানা চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

আমার একটু দূরে এসে দাঁড়াল একটি ছায়ামূর্তি। প্রথমটা আমি চমকে উঠেছিলাম। তারপর ঠিক মানুষটিকে চিনে নিতে আমার কষ্ট হল না। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে আমার খোঁজে ছাদে উঠে এসেছে ফলমন।

অনেক দিনের পরে ফলমনের সঙ্গে মুখোমুখি হল আমার। অসুস্থ ফলমনকে আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে সঙ্গ দিতাম। তার একটুও অসুবিধে আমার দৃষ্টি এড়াত না। কিন্তু এ ফলমন নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে জানে। অসহায়ের মত সাহায্যের প্রার্থী হয়ে তাকায় না অন্যের দিকে।

আজ ফলমন আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আপনার একান্ত বিশ্রামের মুহূর্তটিতে বিঘ্ন ঘটালাম কি মিস হেপবার্ন?

হেসে বললাম, বহুদিন কোন অতিথির আগমন ঘটেনি তাই বিষণ্ণ ছিলাম, আপনাকে দেখে খুশী না হয়ে পারলাম না।

চারদিকে তাকিয়ে ফলমন বলল, আমরা কি একটু বসে কথা বলতে পারি?

ছাদের ওপর পাতা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, এখানে ইচ্ছে হলে বসুন, না হয় চলুন আমার লাইব্রেরীতে।

না, এই তো বেশ। বলতে বলতে ফলমন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করল।

আমি ফলমনের প্রায় পাশাপাশি একটি চেয়ারে বসে পড়লাম।

আজ বড় বেশী কুয়াশা, মিস হেপবার্ন। দেখছেন না সামনের এমন সুন্দর নদীটাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ফলমনের দিকে তাকিয়ে আমি ঐ জ্যোৎস্নার মতই একটু ম্লান হাসি হাসলাম।

হঠাৎ অন্য কথাতে চলে এলো ফলমন, আজ কিন্তু আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

অভিনন্দন! সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলাম, আমাকে অভিনন্দন!

হাঁ, আপনাকেই; অশেষ করুণা আপনার।

ওর ইঙ্গিত আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল না। তবু আকাশপাতাল ভাবনার ভান করে হঠাৎ যেন ধরতে পেরেছি, এমনিভাবে হেসে উঠে বললাম, আপনাকে যেটুকু সেবা করেছি সে আমার কর্তব্য। আপনার মত অবস্থায় আর কেউ পড়লে তাকেও দূরে সরিয়ে দিতে পারতাম কি, বলুন?

ফলমন আমাকে একান্ত নির্বোধ ভেবে নিয়ে বলল, না, না আমি সে কথা বলতে চাইছি না। আপনার যত্নে যে আমি প্রাণ পেয়েছি, সে ঋণ কৃতজ্ঞতায় শোধ হবার নয়। তার কথা বলে আপনার এতবড় উপকারকে আমি লঘু করতে পারব না। আমি অন্য কথা বলছিলাম।

এবার নির্বোধ সেজে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আসল কথাটি ওর মুখ থেকে শোনার প্রতীক্ষায়।

এবার ও একটুখানি হেসে বলল, 'তপ্ত কটাহ থেকে আগুনে গিয়ে পড়া' এমনি একটা প্রবাদ আছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। মেয়েটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে আরও বেশী বিপদের মাঝেই কি আপনি ঠেলে দেননি মিস হেপবার্ন?

আমার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। বললাম, পাহাড়ী বনে আগুন লেগে যদি চলবার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে মরণের ভয় না করেও মানুষ খাদে ঝাঁপ দিয়েই পড়ে। দুটোতেই তার মরণ, তবু আশু মৃত্যুর চেয়ে কয়েক মুহূর্ত পরের মৃত্যুকেই সে মেনে নেয় নাকি?

কূট একটা হাসির আভাস ফুটে উঠল ফলমনের মুখে। সে বলল, আপনি শুধু করুণাময়ীই নন প্রখর বুদ্ধিমতীও।

ফলমনের প্রশংসার তীর যে আমার হৃদয় বিদ্ধ না করে লক্ষ্য-

ভ্রষ্ট হয়ে গেল সে কথা তাকে বুঝতে না দিয়ে হেসে উঠে বললাম, কি বকম ?

আমি যা কবব বলে মনস্থ কবেছিলাম, আপনি তাকেই কাজে রূপ দিয়ে দিলেন।

বুঝলাম, নিজেব অন্যায়কে ঢাকবাব কৌশল ভাল ভাবেই আবিষ্কাব কবে ফেলেছে ফলমন। তবু না বোঝাব ভান কবে বললাম, আবও একটু পবিষ্কাব কবে বলবেন কি ?

এই যে মেযেটিকে আপনি ফার্গুসনেব কুঠিতেই পাঠিযে দিলেন, এতে আপনাব বুদ্ধিব প্রশংসা না কবে পাবছি না। পাশাপাশি কুঠি। সামান্য একটা মেয়েকে বক্ষা কবতে গিযে বিবাদ ঘনিয়ে উঠত দুই তবফেই। তাব চেযে এই যে, যাব জিনিস তাকে ফেবত পাঠিয়ে দিলেন তাতে পবস্পবেব সহযোগিতাই বাড়ল।

একটু থেমে বলল ফলমন, আমিও সেই কথা ভেবেই ওকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম কুঠিতে।

মনে হচ্ছিল, ধুবন্ধব মিথ্যেবাদীকে বলি, মেযেটাকে উচ্ছিষ্ট কবেই বুঝি ফেবত দেবাব নিযম। মনে এলেও মুখে ও কথা বললাম না।

ফলমনেব দিকে তাকিযে বললাম, বাবা ফিবে এলে আপনাব বিচাব বুদ্ধিব কথা নিশ্চয়ই তাঁকে বলব, আব তাতে তিনি আপনাব বিচক্ষণতায খুশীই হবেন।

আমাব কথায নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন একটা শ্লেষেব সুর মিশেছিল, ফলমনেব কানকে তা ফাঁকি দিতে পাবল না। এবাব ফলমন নিজের মূর্তিই ধবল।

মিস হেপবার্ন, আমাকে বুঝতে আপনার ভুল হয়নি দেখছি। না, আপনি সত্যিই বুদ্ধিমতী। এটা আমাব পোশাকী কথা বলে মনে করবেন না। তবে আমাকে যেভাবেই আপনি ভাবুন না কেন, আমি আজ আপনাব কাছে আমার জীবনের কোন সত্যই গোপন করব না।

আমি জানি, আপনাব বাবা ফিরে এলে আপনি তাঁর কাছে আমাব এই অন্যায় আচরণের ছবি তুলে ধরবেন, আর তাতে আমাকে

আপনাদের জমিদারি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু সেদিন যত নিকটেই আসুক তার আগে আপনার কাছে এই অবসরে দু-একটি কথা বলে যেতে চাই। আপনার বাবার ফেরার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে। হয়ত কোনদিন আর আমার দিকের কথাগুলো আপনাকে শোনাবার সুযোগ পাব না।

আমি শান্তকণ্ঠে বললাম, বলুন, কি আপনি বলতে চান।

একটা ম্লান হাসি মুখে টেনে আনাব চেষ্টা করে বলে চলল ফলমন, হয়ত কথাগুলো শুনতে আপনার ভাল লাগবে না, হয়ত আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন, তবু না শুনিয়ে আমি আজ শান্তি পাচ্ছি না। এ একান্ত-ভাবে আমারই কথা, তবু দয়া করে যদি আমাকে আমার মনের কথাটুকু শোনাবার সুযোগ দেন তাহলে আমাব কৃতজ্ঞতাব শেষ থাকবে না।

বললাম, আমার কাছে বলতে আপনার কোন বাধাই নেই, বলুন আপনার কথা।

ফলমন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দূরের আলো-আঁধারী দৃশ্যপটের দিকে। মনে হল তার বক্তব্য সে মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে।

আপনি জানেন আমি জাতিতে পর্তুগীজ। আমার পূর্বপুরুষের রক্তে মিশে আছে দস্যুতা। আমরা এ দেশের নদী নালা, সাগর নগর সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়িয়েছি খোলা তলোয়ার হাতে লুঠতরাজ করে। এই লুণ্ঠনে আমাদের লজ্জা নেই। নারীহরণে আমরা নির্বিকার।

আজ আমি সংসারজীবনে নিঃসঙ্গ হলেও আমার রক্তে এসে মিশেছে দুটি ধারা। আমার পিতামহ ছিলেন পর্তুগীজ আর পিতামহী বাঙালী।

আমি সবিস্ময়ে ফলমনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে হেসে বলল, আমাকে দেখে বাঙালী রক্তের কোন ছাপই আপনার চোখে পড়বে না, কিন্তু যা সত্য তাই আজ বলব।

আমি যে মেয়েটিকে কলমদান গাঁ থেকে কয়েকদিন আগে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিলাম, যাকে আপনি মুক্তি দিয়েছেন, সে আমার পূর্ব পুরুষের রক্তেরই শিকার।

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, কি রকম ?"

না, ঐ মেয়েটির ভেতর পর্তুগীজ রক্তের কোন সম্বন্ধ নেই। আমি বলতে চাইছি আমাদের রক্তে নারী হরণের যে জোয়ার আসে তাতেই ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিলাম ঐ মেয়েটিকে। তাছাড়া আমার পিতামহের যে কাহিনী আজ আপনাকে শোনাতে বসেছি তাতে এমনি একটি কাহিনীব বীজ লুকিয়ে বয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে আশ্চর্য একটা মিল রয়েছে বলেই আমি আপনাকে আমাব অতীত পূর্বপুরুষের কাহিনীটুকু শোনাতে প্রয়াসী হয়েছি।

কথার মাঝে থামল ফলমন। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করল তার আসল কাহিনী।—

আমার পিতামহ ছিলেন একটি দস্যুদলের অধিনায়ক। ষাট বৈঠার একখানা ছিপ এবং কয়েকখানা দ্রুতগামী নৌকো ছিল তাঁর অধীনে। তাই নিয়ে তিনি মগ আর ফিরিঙ্গীসহ একটি বড় দল গড়ে বঙ্গোপসাগরে ঘুরে বেড়াতেন। দলবদ্ধ যাত্রী নৌকোর ওপরে বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথমে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন পাল, মাস্তুল। তারপর ধনদৌলত যা কিছু পেতেন সব কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব কবে ছেড়ে দিতেন। সাহস করে প্রতিরোধ কবতে বড় একটা কেউ এগিয়ে আসত না। হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকোগুলো যখন কলার মোচার মত ঢেউয়ের মাথায় এদিক ওদিক ছত্রাকারে ভেসে যেত তখন নিজের বিরাট নৌকোর পাটাতনেব ওপর দাঁড়িয়ে তিনি হা হা করে হাসি ছড়াতেন।

কখনো বা কর্মঠ নারীপুরুষ ধরে ধরে আনতেন সমুদ্র তীরবর্তী জনপদ, গ্রাম, গঞ্জ থেকে। তাদের বাঁ হাত ফুটো করে একই বেতের ছিলা দড়ির মত কবে ঢুকিয়ে একসঙ্গে সবাইকে বেঁধে রাখতেন। খেতে দেওয়া হত তাদেব চাল। নৌকোর পাটাতনের ভেতর অন্ধকার গহ্বরে ফেলে রাখা হত তাদের। তারপর বালেশ্বর, খেজুরী প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলিতে ওদের বিক্রি কবা হত ক্রীতদাস-দাসীরূপে! এ ব্যাবসাতে মুনাফা ছিল প্রচুর।

কিন্তু আমার পিতামহ এই দাস ব্যাবসায়ে অর্থ পেলেও আনন্দ

পেতেন না। কোন উত্তেজনাপূর্ণ কাজ হলেই তিনি তার মধ্যে মেতে থাকতে ভালবাসতেন। এসব কাজ অবশ্য হাতের কাছে সব সময়ে পাওয়া যেত না। কিন্তু তলোয়ার খাপে বন্ধ করে শুধু মর্চে পড়তেও তিনি দিতে চাইতেন না। তার আগেই কোন একটি খুনজখম, লুঠতরাজের খবর এসে পড়ত তাঁর কাছে।

এজন্যে তাঁর নিযুক্ত একটি দলও থাকত। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংবাদ সংগ্রহ করত। কোন নবাবের লোকেরা বাদশাহী কর পরিশোধের জন্য সেপাই শান্ত্রী নিয়ে পথ চলেছে, কোথাও বা নৌকো করে চলেছে জমিদারের সিন্দুক ভর্তি মোহর, এসব খবর তারা সংগ্রহ করে বেড়াত বহু গোপন সূত্রে।

তারপর শুরু হয়ে যেত কাজ। ঠগী, ফাঁসুড়েদের মত গোপন ছলাকলায় যাত্রীদের ভুলিয়ে তাদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে হত্যা করাকে আমার পিতামহ কাপুরুষের কাজ বলে মনে করতেন।

তিনি সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার উঁচিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে মেতে যেতেন। সেপাইরা মোহরের থলে পথে ফেলে সাধারণত সরে পড়ত। তারা প্রভুর অর্থের জন্যে প্রায়ই প্রাণ দিতে চাইত না। কিন্তু লড়াই শুরু হলে উত্তেজনার আনন্দে ফেটে পড়তেন আমার পিতামহ। তাঁর তলোয়ারের ঘায়ে কাঁধের থেকে ছিটকে পড়ত মাথা। রক্ত ছুটত ফিন্‌কি দিয়ে, আর তিনি তাই দেখে হাসির তুফান তুলতেন। যেখানে যত বাধা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁর তত উল্লাস।

বললাম, হার্মাদদের এসব কাহিনী আমি শুনেছি আমার বাবার মুখ থেকে। এখন যেমন সরকার শক্ত হাতে শাসনের হাল ধরেছেন, সেদিন তেমনটি ছিল না। তাই দেশের অস্থির অবস্থার সুযোগে লুঠ তরাজ ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা।

আমার কথা শেষ হলে ফলমন বলল, এবার যে কাহিনী আপনার কাছে আমি তুলে ধরব সে ঘটনা হয়ত আপনার নাও জানা থাকতে পারে।

আমি ফলনের পরবর্তী কাহিনী শোনার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে তাকিয়ে রইলাম।

হরিদাস শেঠ ছিলেন জহরতের ব্যবসায়ী। বাঙালীদের ভেতর জহরতের এতবড় ব্যবসায়ী সেদিন কেউ ছিলেন না। তাঁর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর একমাত্র কন্যা সুবর্ণমঞ্জরী পেয়ে গেলেন পিতার অমিত ঐশ্বর্যেব অধিকার। তখন সুবর্ণমঞ্জরী বিবাহিতা। স্বামী ঘরজামাই হয়ে শ্বশুরেব কাজকারবারই তদাবক কবছিলেন। হরিদাস শেঠ মারা গেলে তাঁরই ওপব পড়ল সমস্ত ব্যবসায় পরিচালনার ভার। কিন্তু পিতার সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা থেকে গেল সুবর্ণমঞ্জরীর হাতে।

এদিকে সুবর্ণমঞ্জরী একটি কন্যাসন্তানের জননী হয়েছিলেন। কন্যাটি পঞ্চবর্ষীয়া হতে না হতেই সুবর্ণমঞ্জরী বিধবা হলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন মহিলা। তাই পিতৃদত্ত জহরতের ব্যবসায় চালিয়ে নিতে তাঁর কোন অসুবিধেই হয়নি। কিন্তু অসুবিধেয় পড়েছিলেন তিনি অন্যদিক থেকে। বিধাতা তাঁকে দিয়েছিলেন জহবতের চেয়েও মূল্যবান এক বস্তু, তা হল তাঁর পাগল-করা রূপ।

রাজা মহারাজেরা ভিড় করে আসতেন হীরে জহরত কিনতে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তাঁদের চাপা পড়ে যেত সুবর্ণমঞ্জরীকে দেখে। কত লোভনীয় প্রস্তাব যে মহারাজেরা তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার লেখাজোকা নেই!

কিন্তু তাঁদের সব প্রস্তাবকেই তিনি মনের নিভৃতে পরিত্যক্ত এক কুঠরিতে তালা বন্ধ করে রেখে দিতেন। কখনো খুলে নেড়ে চেড়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করতেন না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হৃদয়ে খুন না ঝরিয়ে ফিরে আসবে এমন লোক সে যুগে খুব কমই ছিল। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ীর মেয়ে, তাই হাসি দিয়ে ভোলাতেন সবাইকে, ফিরিয়ে দিতেন না কাউকেই কটু কথায়।

আমার পিতামহের কানে এসে পৌঁছল সুবর্ণমঞ্জরীর খবর। রাশি রাশি হীরে জহরত তাঁর চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিতে লাগল। তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন সুবর্ণমঞ্জরীর সীমাহীন সম্পদের।

সে দিনটি ছিল সুবর্ণমঞ্জরীর একমাত্র কন্যা বেদবতীর বিবাহের দিন। হিন্দুদের ভেতর নাকি গৌরীদানের একটি প্রথা আছে। অল্প বয়েসের মেয়েদের বিয়ে দেবার রীতি। বেদবতী ছিল নয় বছরের মেয়ে। সুবর্ণমঞ্জরী তারই বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। অফুরন্ত ঐশ্বর্য তাঁর। সবই পাবে কন্যা জামাতা।

সুসজ্জিত সভামণ্ডপ। নিমন্ত্রিত অভ্যাগত পরিজন। রাতের আকাশ জুড়ে চোখ ঝলসানো রোশনাই। পাইক বরকন্দাজে গম গম করছে প্রাসাদের বার-মহল।

মুহূর্তে দুঃসংবাদ পৌঁছে গেল সুবর্ণমঞ্জরীর কানে। অন্দরমহলে তিনি কিসের যেন তদারক করছিলেন। পিতার আমলের লেঠেল সর্দার সহসা সেখানে এসে তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে যা বলল, তাতে সুবর্ণমঞ্জরীর চক্ষুস্থির।

কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন তিনি। কাউকে কোন কথা না জানিয়ে ঐ পুরাতন বিশ্বস্ত লেঠেল সর্দারকে খিড়কির দরজায় অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন গুপ্ত গৃহে। একে একে অঙ্গে তুলে নিলেন রক্তাম্বর। হীরে মণি মাণিক্যের অঙ্গাভরণে মনোহারিণী মূর্তিতে সজ্জিত করলেন নিজেকে।

সুবর্ণমঞ্জরীর দেহ থেকে মুছে গেল বৈধব্যের নিরাভরণ বেশ। ছদ্মবেশে সংগোপনে তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর বহুদিনের পুরাতন লেঠেল সর্দারের কাছে।

মা, একি মূর্তি তোমার ?

কোন কথা নয় রঘু, আমাকে নিয়ে চল্ সেই হার্মাদ দস্যুদের সর্দারের কাছে।

সে যে ভয়ঙ্কর মা ! একা আমি তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তার হাত থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করব কি করে ?

সে ভার আমার। তবে শুধু তুই এই প্রতিজ্ঞা কর্, তোর জীবন থাকতে এই অভিযানের কথা দ্বিতীয় কারো কানে পৌঁছে দিবি না।

চোখের জল মুছে বৃদ্ধ রঘু বলল, সে যে আমারও অপমান মা জননী!

দুজনে চলল পেছনের বাগান ছাড়িয়ে। সামনেই নদী। বাগান আর বালুর চরটুকু পেরিয়ে সিকি মাইলের মত পথ।

একটা খাঁড়ির তলায় যেখানে নদীর উঁচু পাড়ের ছায়া পড়েছে জলে সেখানে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে কয়েকখানা নৌকো। রঘু পথ দেখিয়ে সুবর্ণমঞ্জরীকে নিয়ে চলল সেই দিকে।

হঠাৎ খাঁড়ির ওপর দুটো মানুষকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। হাতে তাদের খোলা তলোয়ার। নির্ভয়ে সুবর্ণমঞ্জরী তাদের দিকেই এগিয়ে গেলেন।

সেই স্বল্প চাঁদের আলোয় দুটো বোম্বেটের চোখ ঝলসে গেল। মূল্যবান হীরে জহরত থেকে ঠিকরে বের হচ্ছিল আলো।

সুবর্ণমঞ্জরী তাদের কাছে গিয়ে বললেন, কোথায় তোমাদের সর্দার, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, নিয়ে চল তাঁর কাছে।

ইঙ্গিতে তিনি রঘুকে সেই নদীর চরে অপেক্ষা করতে বলে দুটি দস্যুর সঙ্গে সাবধানে নীচে নেমে গেলেন।

প্রথমে ঐ দুটো লোক সুবর্ণমঞ্জরীকে একটি ছোট নৌকোয় তুলল। তারপর অন্য নৌকোগুলোর পাশ কাটিয়ে তাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল মাঝ নদীর দিকে।

কিছুক্ষণ বেয়ে চলার পর সুবর্ণমঞ্জরীর চোখে পড়ল একটি বজরা। যেমন বড় আকারের সেটি তেমনি গঠনের দিক থেকেও আকর্ষণীয়। আরও কাছাকাছি হলে দেখা গেল বজরার পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এক বিদেশী পুরুষ।

দূর থেকে সুবর্ণমঞ্জরী বুঝলেন, দলপতি বিস্মিত হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছেন।

বজরার কাছে পৌঁছল নৌকো। সিঁড়ি ফেলে দেওয়া হল। সুবর্ণমঞ্জরী অবলীলায় অসংকোচে উঠে এলেন বজরার ওপর।

এবার দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ। সুবর্ণমঞ্জরীর

মনের মধ্যে তখন কি ভাবনার উদয় হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়, তবে দস্যু-দলপতির জীবনে বুঝি এতবড় বিস্ময়েব উদয় এর আগে কখনও হয়নি।

সেদিন আমার পিতামহ তাঁর লুণ্ঠনকারী তীক্ষ্ণ দুটো চোখের দৃষ্টি বোধ করি হারিয়ে ফেলেছিলেন। মূল্যবান হীরে জহরতের দীপ্তি তাঁর চোখের দৃষ্টিকে সেদিন ধাঁধিয়ে দিতে পারল না। একটা বিস্ময়-ভরা চোখ মেলে নির্বাক দস্যুপতি সেই মোহময়ী নারীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রথমে কথা বললেন সুবর্ণমঞ্জরী, আপনার যাবার আগেই আমি আপনার কাছে চলে এলাম সাহেব। এতবড় মানীলোক আপনি, বিনা নিমন্ত্রণে গেলে আপনাব অমর্যাদা হবে। তাই অতিথির কাছে আমন্ত্রণ জানাতে আমাকেই আসতে হল।

মুক্তোর পাঁতির মত সুন্দর দাঁতেব হাসি ছড়িয়ে দিলেন সুবর্ণ-মঞ্জরী।

আমার পিতামহের তখন যৌবনের দিন। যে চোখে তাঁর উদ্দামতার আগুন জ্বলত, সহসা সে চোখেব দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো।

তিনি দেখতে লাগলেন শুধু রক্তের রঙই লাল নয়, আকাশের প্রথম সূর্য লাল হয়েই জেগে ওঠে। গোলাপ লজ্জায় রাঙা হয়েই ফোটে।

দস্যু দলপতি সবিনয়ে বললেন, আপনার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম, কিন্তু আমন্ত্রণকারীকে সামান্য আপ্যায়নের সুযোগ আমাকে দিন।

এরপর সেই নৌকোর নিভৃত ঘবে সেদিন এক দস্যুর সঙ্গে এক দুঃসাহসী রমণীর অনেক কথাই হয়েছিল।

সুবর্ণমঞ্জরী ফিরে যাবার সময় একটি কথা নিয়ে গিয়েছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা দিয়েও গিয়েছিলেন।

ফিরিঙ্গী দস্যু তাঁর জীবনে এই প্রথম আক্রমণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেও নিরস্ত হলেন। তিনি সুবর্ণমঞ্জরীকে কথা দিলেন, বিবাহ

উৎসবে খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। কিংবা হরণ করবেন না তাঁর কিশোরী কন্যাকে বিবাহ বাসর থেকে।

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল আনন্দ-উৎসব। নিমন্ত্রিতেরা ফিরে গেলেন কন্যা জামাতাকে আশীর্বাদ জানিয়ে।

পরদিন জামাতা আর কন্যাকে কাছে ডেকে বললেন সুবর্ণমঞ্জরী, আমার যা কিছু পিতৃদত্ত ধন, সমস্তই আমি তুলে দিলাম আজ থেকে তোমাদের হাতে। একে সযত্নে রক্ষা কর। লক্ষ্মী অচলা থাকবেন।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার মনে বহুদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা আছে বাবা, কন্যা সম্প্রদানের পরই আমি কাশী যাত্রা করব। তোমরা নতুন জীবনে প্রবেশ করলে এখন আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও।

চোখের জলে মা ও মেয়ের বিদায় হল। ত্বরিতে গৃহের সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করে সুবর্ণমঞ্জরী রঘুকে কাছে ডেকে বললেন, রঘু, তোর কোলে পিঠেই আমি এতবড় হয়েছি, আজ আমাকে সত্য রক্ষা করতে দে।

রঘু বার বার চোখ মুছে বললে, ছোটবেলা থেকেই তোমাকে দেখেছি মা। কর্তাবাবা বলতেন, এমন বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী মেয়ে নাকি হয় না। এ ব্যাপারেও আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ মা! তোমার বিবেচনার কাছে আমি কোন ছার। শুধু আদেশ কর মা, রঘু প্রাণ দিয়ে তার মায়ের আদেশ পালন করে যাবে।

সুবর্ণমঞ্জরী বললেন, জীবনে আমি আর তোদের কাছে ফিরে আসতে পারব না রঘু। আমার মেয়েকেও তুই মানুষ করেছিস আমারই মত। সে আমার চেয়ে তোর কাছে থাকতেই যে বেশী পছন্দ করত তা তুই জানিস। তোর গলা জড়িয়ে সে গল্প শুনতে কত ভালবাসত।

থামলেন সুবর্ণমঞ্জরী। বোধ হয় একটা গভীর দুঃখ তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, তিনি তাকে দমন করে বললেন, আমার

মেয়ে রইল, এই বাড়ী রইল, সব কিছু তুই দেখিস এখন থেকে। তোর হাতে তদারকির ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

রঘুকে সঙ্গে করে শেষ রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে এলেন সুবর্ণমঞ্জরী। ঠিক, তেমনি দাঁড়িয়েছিল দুটি লোক। সুবর্ণমঞ্জরী নৌকোয় ওঠার আগে রঘুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমি ব্যবসায়ীর মেয়ে রঘু, প্রাণ থাকতে ধন তুলে দিতে পারলাম না ডাকাতের হাতে। আর তাছাড়া মায়ের কাছে মেয়েব মান অনেক বড় রঘু। আমার চোখের ওপর তার লাঞ্ছনা কেমন করে সইতাম বল। আজ থেকে মনে কবিস তোব মা মবে গেছে।

রঘু ঢুকরে কেঁদে উঠল। সুবর্ণমঞ্জবীর চোখও শুকনো ছিল না। নৌকো মাঝ নদীর দিকে এগিয়ে চলল।

সেদিন সুবর্ণমঞ্জরীর অঙ্গে একটিও আভরণ ছিল না। বিধবার শুভ্র বেশেই তিনি নিজেকে ঢেকে বেখেছিলেন। আবার তেমনি সিঁড়ি বেয়ে নির্বিকার সুবর্ণমঞ্জরী উঠে এলেন দস্যু দলপতির খাস কামরায়।

মৃদু হেসে বললেন, আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনার কথা আপনি রেখেছেন, এখন আমার কথা রাখতে আমি হাজির হলাম আপনার কাছে।

দলপতি বললেন, সত্যিই তুমি রহস্যময়ী। গত বাত্রে তোমাকে দেখেছি রক্ত বসনে শোভিত। আমার অন্তরে জ্বালিয়ে গিয়েছ দহন জ্বালা। আর আজ সমস্ত আকাশের জ্যোৎস্না মেখে এসেছ তোমার অঙ্গে। কি বিচিত্র, কি মনোহারিণী তুমি।

একটু থেমে বললেন, চিরদিনই মানুষের বিত্ত হরণ করেছি আমি, কিন্তু আজ আমার হৃদয় হারাতে হল তোমার কাছে।

স্থির দুটি চোখ মেলে দস্যুরাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন সুবর্ণমঞ্জরী।

দলপতির আদেশে নদীর স্রোতে ভেসে চলল তরণী। সুবর্ণমঞ্জরীও ভেসে চললেন জীবনের নতুন কোন বন্দরের উদ্দেশ্যে।

কতক্ষণ প্রজ্বলিত দীপশিখার দুইপাশে মুখোমুখি বসে রইলেন

দুজনে। কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু দস্যুপতির চোখে একটি মুগ্ধ ভালবাসার ছবি। মনে মনে তাঁর একটি জিজ্ঞাসা, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনের সন্ধান এতদিনে যদি বা পাওয়া গেল, কেমন করে তার সমাদর করি, কোন্ নিভৃত গোপনতম স্থানেই বা তাকে তুলে রাখি!

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, দস্যু জীবনের এইখানেই ফেলে দিলাম যবনিকা। আর নয়। যৌবনের যথার্থ সুধা এবার পান করতে হবে আকণ্ঠ। দিকে দিকে আর সংহারের হাতিয়ার নিয়ে বেড়াব না, নিভৃতে নিরালায় রচনা করব এক সুখের সংসার।

ভোরের আকাশে শুকতারা জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল। দস্যু-দলপতি তাকিয়ে দেখলেন সুবর্ণমঞ্জরীর দুটি চোখ বন্ধ হয়ে এলো। দুটি হাত যুক্ত করে তিনি বসলেন প্রার্থনার ভঙ্গীতে। কতক্ষণ পরে প্রণাম শেষে চোখ মেললেন।

মধুর হাসি ছড়িয়ে বললেন, আজ আমাদের প্রথম মিলনের দিন, তাই না?

দলপতির মুখে প্রথম প্রভাতের তারুণ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি আবেগ মথিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, তাই মঞ্জরী।

সামান্য সময়ের নীরবতা দুজনকে ঘিরে রইল। তারপর বললেন সেই তরুণ দস্যুপতি, আজ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে তুমি কিছু প্রার্থনা করবে না আমার কাছে? সমস্ত মন উজাড় করে আমি তোমাকে কিছু দিয়ে অন্তরে তৃপ্ত হতে চাই।

চোখে জল টলমল করে উঠল সুবর্ণমঞ্জরীর। মুখে মৃদু হাসি টেনে এনে বললেন, আমার প্রার্থনা তুমি সত্যিই কি পূর্ণ করতে পারবে?

মানুষের চেষ্টার মধ্যে যা আছে তার ভেতর তোমার প্রার্থনা থাকলে আমি নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করার চেষ্টা করব।

আমাকে কাশী যাবার অনুমতি দাও।

কোন দ্বিধা কোন সন্দেহ মনে না এনে দলপতি বললেন, তাই হবে। কথা যখন দিয়েছি তোমাকে তখন তা ফিরিয়ে আমি আর নেব না।

সঙ্গে সঙ্গে দলপতির আদেশে ফিরল নৌকোর বহর। উল্টো স্রোতে উজান বেয়ে চলল সুবর্ণমঞ্জরীর নৌকো।

নানা দিক দেশ ঘুরে অবশেষে কাশীধামে পৌঁছলেন সুবর্ণমঞ্জরী। সঙ্গে তাঁর তখন রয়েছেন একমাত্র আমার পিতামহ।

সুবর্ণমঞ্জরীকে বারাণসীর সীমায় পৌঁছে দিয়ে তিনি বললেন, এবার আমায় ছুটি দাও মঞ্জরী। আর কোনদিন দেখা হবে না তোমায় আমায়। আজ একটি অনুরোধ শুধু আমি তোমায় করব, যাবার বেলা বল সেটুকু তুমি রক্ষা করবে।

সুবর্ণমঞ্জরীর চোখে জল। তিনি ভাঙা অস্ফুট স্বরে বললেন, বল। আমি রাখব, নিশ্চয়ই রাখব।

আমার সঞ্চয়ে এখন যেটুকু সম্পদ আছে, তা নিয়ে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। এ বোঝা আমি আর বইতে পারছি না। আজ থেকে আমার ভেতরের দস্যুটার মৃত্যু হোক। শুরু হোক আমার নতুন পথে যাত্রা।

সুবর্ণমঞ্জরী আমার পিতামহ প্রদত্ত মোহরের থলে হাত বাড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাতার হাতটি নিবিড়ভাবে ধরে রেখে বললেন, আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে সপ্তপদীর। সাত পা একসঙ্গে চললে হৃদয়-বন্ধন হয়। আমরা দুজনে একসঙ্গে চলে এসেছি দীর্ঘ দুর্গম পথ। তুমি দস্যু, তবু দস্যুতা করনি কোনদিন। তোমার চেয়ে হৃদয়ের কাছাকাছি আমি আর কাকে পাব বল। তুমি এস, এই পুণ্যতীর্থে বিশ্বনাথের চরণে প্রণাম করে আমরা নতুন জীবন শুরু করি।

থামল ফলমন। কথা তার শেষ হল। আমি সেদিন গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে শুনলাম সে কাহিনী।

এক সময় ফলমনের দিকে তাকিয়ে বললাম, কিন্তু কলমদানের ঐ মেয়েটিকে হরণের সঙ্গে এ কাহিনীর সম্পর্ক কোথায়?

ফলমন হেসে বলল, পিতামহ একটি বাঙালী মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী করে নিজের দস্যু-জীবনে ছেদ টানতে পেরেছিলেন, হয়ত তার বংশধরের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হতে পারত।

আমি সেদিন মনে মনে হেসে উঠেছিলাম। যদি ফলমনের কাহিনী সত্য হয় তাহলে তার পিতামহের পরিবর্তন আশ্চর্য ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে চরিত্রের দিক থেকে সামান্যতম সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি ফলমনের। যদি উত্তরাধিকারসূত্রে ফলমন কিছু পেয়ে থাকে তার পিতামহের কাছ থেকে তাহলে তা শুধুমাত্র হীন বোম্বেটে স্বভাব। পিতামহের উত্তর জীবনের কোন স্পর্শই তার রক্তে সঞ্চারিত হবার লক্ষণ আমি দেখিনি।

তবু বললাম, একজনের সঙ্গে অন্যজনের জীবনের পথ সমান হবে এ সত্যে আমি বিশ্বাসী নই।

সেই অস্পষ্ট চাঁদের মরা জ্যোৎস্নায় আমি দেখলাম ফলমনের বাঘের মত দুটো চোখ জ্বলে উঠল। মুহূর্তকাল মাত্র, তারপর মৃত মানুষের মত সে চোখ ভাব লেশহীন হয়ে গেল।

উঠে যাবার সময়ে বলল ফলমন, আর একটা কথা মিস হেপবার্ন, ফার্গুসন আপনার বদান্যতার জন্য আমার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গায়ে জ্বালা ধরে গেল আমার। বললাম, তাহলে আসল সত্যটুকু জেনে যান, মেয়েটি স্বেচ্ছায় চলে যেতে না চাইলে আমি তাকে আশ্রয়ই দিতাম।

তপ্ত কণ্ঠে বলল ফলমন, তাতে আপনার মঙ্গল হত না মিস হেপবার্ন। আর আমিও তা হতে দিতাম না।

কথাটা বলে সে ক্রূর একটা হাসি ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

আমি সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এর অর্থ ?

অর্থ খুবই সহজ। আপনার বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর সমস্ত জমিদারি রক্ষার ভার আমার ওপর। সুতরাং জমিদারির মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আপনার যত অপ্রীতিকরই হোক, আমাকে সে কাজ করে যেতে হবে।

মনে মনে ভাবলাম, ইতিমধ্যেই ফলমন সীমাহীন সাহসের অধিকারী হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সে আমার অপমান করতেও পেছপা হবে না। আমি আমার মনোভাব গোপন রেখে সহাস্যে বললাম,

এতদিনে বুঝেছি কেন আমাদের জমিদারির শ্রী সম্পদ এত দ্রুত বেড়ে চলেছে! আমার এ কথাকে ব্যঙ্গ বলে আবার যেন ধরে নেবেন না। আমি আপনার স্পষ্ট কথায় সত্যিই শ্রদ্ধা বোধ করছি।

ফলমন এবার সত্যিই আমার কথার মধ্যে কোন রকম ছলনার ছোঁয়া পেল না। সে সানন্দে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করল, এবং পরদিন বাগানে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে তবে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

এরপর মেরী, বাবার ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার এক একটি দিন যে কি ভাবে কেটেছে সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

আমাকে সে-সময় আত্মরক্ষার জন্য কয়েকটি দিন নিপুণ অভিনেত্রীর জীবনই যাপন করতে হয়েছিল। আমি সেই কটা দিন একটা ভয়ঙ্কর রক্তলোলুপ জানোয়ারের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, ভাবলে আমার সারা গা আজও শিউরে ওঠে মেরা।

যীশুকে ধন্যবাদ, পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করছি, যে কোন মূহূর্তে ওর নখরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন বাবা এসে গেলেন।

আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রথমটা যেন চিনতেই পারলেন না। সত্যি আতঙ্ক আর আত্মরক্ষার সংগ্রামে তখন আমি প্রায় মৃত একটা মমিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম।

বাবা যখন আমাকে গভীরভাবে আদর করে চিন্তিত মুখে আমার শরীর মনের খবর জানতে চাইলেন তখনই আমি তাঁর বুকে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। একে একে বাবা আমার মুখ থেকে সব কথা শুনে বললেন, এই মুহূর্তে আমি ফলমনকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাসে আমি ওর ওপর জমিদারির সব ভার তুলে দিয়েছি। ইতিমধ্যে সে আমার বিরাগ লক্ষ্য করলে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র নিয়ে সরে পড়বে। তাতে আমারই ঘটবে সমূহ বিপদ। দু' একটা দিন যেতে দাও, আমি সবকিছু বুঝে নিই আগে, তারপর অবস্থা মতো ব্যবস্থা করা যাবে।

বাবা শেষ পর্যন্ত ফলমনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্যে তাঁকে দিতে হয়েছিল প্রচুর খেসারত। বাবার প্রদত্ত টাকাতেই ফলমন কিনল তার জমিদারি। এখন সে একজন ডাক-সাইটে কুঠিয়াল।

কথা শেষে মৈত্রেয়ী বলল, কি সাংঘাতিক মানুষ ফলমন। মনে হচ্ছে যেন তোমার কথা শুনছি না দিদি, কতকগুলো দুঃস্বপ্ন দেখে চলেছি।

অ্যানা উঠে পড়ে বলল, পশ্চিমে চাঁদ ঢলে পড়েছে, এখন চল শেষ রাতটুকু বিছানায় গড়িয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক্।

নীলকরদের আন্দোলনের পরোক্ষ ফলস্বরূপ সরকার থেকে একটি অধিকার তারা পেয়ে গেল। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করে বিচারকের আসনে বসতে তাদের কোন বাধা রইল না। এখন থেকে শুধু কয়েকজন ইংরাজ বিচারকেরই সাহায্য পাওয়া নয়, নিজেদের সুবিধে কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নেবার সুযোগও এসে গেল নীলকর সাহেবদের হাতে। আঠারোশ' ছাপ্পান্ন সালে এমনি এক বিচারক নিযুক্ত হলেন ফরলঙ সাহেব। এ অঞ্চলের নীলকরেরা তাঁকে ডিনারে আপ্যায়িত করবে বলে মনস্থ করল। আয়োজনে প্রধান অংশ নিল ফলমন। মানপত্র রচনা করা হল। বহুমূল্য পার্সিয়ান কার্পেট কেনা হল তাঁকে উপহার দেবার জন্যে। ফার্গুসনের কুঠিতেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অ্যানা যথারীতি হাজির হল সেখানে। আয়োজনের কোন ত্রুটিই ছিল না। কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ফলমনকে সেখানে দেখতে পাওয়া গেল না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ফলমন নাকি জরুরী কাজে শহরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলে গেল বুদ্ধিমতী অ্যানার মনে।

অনুষ্ঠানের মাঝেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল অ্যানা। সকলেই সহানুভূতি জানাল তাকে। অনুষ্ঠানে না থাকতে পারার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ও পথে নামল। তেজীয়ান ঘোড়া। কোচোয়ানকে অ্যানা অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বলল, জলদি চলো!

নুড়ির রাস্তায় ভীষণ শব্দ করে গাড়ি চলল ছুটে। কিছু পথ এসেই অ্যানা গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ল। গাড়ির পথ অনেক ঘুরে গেছে। কুঠিতে পৌঁছবার আগেই হয়তো কোন একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।

পাশেই আসছিল অ্যানার দেহরক্ষী সেপাই। অ্যানা তার ঘোড়াটাই আপাততঃ বেছে নিল। ছুটে চলল ঘোড়া ফাঁকা প্রান্তরের বুক চিরে। তেজী ঘোড়া ছুটে চলেছে, কিন্তু অ্যানার মন ছুটেছে তারও আগে। কত অশুভ চিন্তা তাকে আজ তোলপাড় করে ফিরছে।

কুঠির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল অ্যানা। নীচের প্রান্তর থেকে উঁচু হয়ে উঠে গেছে কুঠির পথ। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে অগণিত নক্ষত্র। তারই আলোয় যতটুকু দেখা যায় অ্যানা দেখল উঁচু রাস্তার ওপর একটা অশ্বত্থগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে এক অশ্বারোহী।

ঘোড়া থেকে নেমে বিপরীত পথে অ্যানা নিঃশব্দে ঢুকে এলো কুঠিতে। সবার অলক্ষ্যে সে উঠে এলো ওপরের ঘরে।

একি, পোশাক পরছে মেরী এমন অসময়ে!

পেছন থেকে এসে দাঁড়াল অ্যানা। আয়নায় তার ছায়া পড়তে দেখে প্রায় চমকে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল মৈত্রেয়ী। মুখে হাত চেপে বারণ করল তাকে অ্যানা।

টেনে নিয়ে এলো বারান্দায়।

কি ব্যাপার মেরী ?

তখনও যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি মৈত্রেয়ীর।

তুমি, তুমি কোথা থেকে এলে! তুমি না ভীষণ অসুস্থ হয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ ?

হাত বাড়িয়ে সে নির্দেশ করল কুঠির গেটের দিকে! একখানা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

এখন বল দেখি ব্যাপারটা কি ? অ্যানা জিজ্ঞেস করল সবিস্ময়ে।

আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি তোমাকে! ফার্গুসন সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তাড়াতাড়ি করে ডেকে পাঠিয়েছ আমাকে। ফার্গুসন সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর গাড়ি

আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে, আর তুমি এমন অভিনয় করছ যেন কিছুই জান না।

আবার এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল অ্যানা হেপবার্নের চোখে।

পোশাক পরিবর্তন করে নিল অ্যানা। মুখে কালো রেশমী একখানা ভেল জড়িয়ে ঢুকল শোবার ঘরে। বন্দুকটা হাতে নিয়ে অতিরিক্ত দু'একটা টোটা সঙ্গে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, মেরী, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে আজ। যদি তোমাকে সত্যিই ভালবেসে থাকি তাহলে জয়ী হবার জন্যে মরণপণ করেও লড়ব আমি।

বিমূঢ় বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল মৈত্রেয়ী। কোনকিছু বলার আগেই বেরিয়ে গেল অ্যানা ঘরের বাইরে। বারান্দা থেকে মৈত্রেয়ী দেখল, অ্যানা গাড়িতে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িখানা নিরন্ধ্র রাতের অন্ধকারে।

গাড়ি চলেছে। অ্যানা পার হয়ে এলো রাস্তার ওপরের অশ্বত্থগাছটা। পেছনে আর একটি ঘোড়সওয়ার আসছে। অ্যানা সবই বুঝতে পারছে। একসময় গাড়িটা থেমে গেল। এবার শালবনের ভেতর দিয়ে পথ। কোচোয়ান নেমে গেল গাড়ি থেকে। অন্ধকারে চালক বদল হল। সবই বুঝল অ্যানা। আগের কোচোয়ান চলে গেল ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে।

ফলমন শিকারকে একা পেতে চায়। অ্যানা হাসল মনে মনে। সুবর্ণরেখা নদী বাঁয়ে রেখে গাড়ি চলেছে শালবনের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে। হঠাৎ গাড়িখানা থেমে গেল। লাফ দিয়ে ফলমন নীচে নামল। ঘোড়াটাকে গাড়ি থেকে খুলে দিলে। এবার এগিয়ে আসছে ফলমন। একটা ক্ষুধিত নেকড়ে এগোচ্ছে। আবছা চাঁদের আলোয় বীভৎস দেখাচ্ছে মুখখানা।

খবরদার !—চেঁচিয়ে উঠল অ্যানা। হাত তুলে দাঁড়াও ওখানে, এক পা এগিয়েছ কি মৃত্যু নিশ্চিত।

বন্দুক তুলে ধরল অ্যানা ফলমনের বুক নিশানা করে।

জীবনে এমন আশ্চর্য আর অসহায় বোধ করেনি কখনো ফলমন।

সাপের মেরুদণ্ডে ঘা পড়লে যেমন সে এঁকেবেঁকে পালাবার চেষ্টা করেও পালাতে পারে না ফলমনের অবস্থাটাও ঠিক তেমনি হল।

হাসল অ্যানা,—বন্দুক আছে তোমার ?

গাড়িতেই আছে।

অ্যানা ফলমনের বন্দুকখানা গাড়ির ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এগিয়ে দিল ফলমনের হাতে।

তোমার হাতে কোন অস্ত্র নেই, তাছাড়া একটা হাতও তুমি হারিয়েছ। তবে আমি জানি, তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ।

লাফ দিয়ে পড়ল অ্যানা গাড়ি থেকে। মুহূর্তে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুদূর থেকে ভেসে এলো অ্যানার গলা,—

আমি এখানেই রয়েছি ফলমন। তুমি শব্দ শুনে বন্দুক চালাও। পরে আমার পালা।

এই যে এখানে আমি রয়েছি,—অ্যা—না হেপ্‌বা—র্ন।

গর্জে উঠল ফলমনের বন্দুক। দূর পাহাড় আর অরণ্যে কতক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি তুলল সে আওয়াজ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

এবার আমার পালা,—চেঁচিয়ে উঠল অ্যানা অন্ধকারের বুক চিরে।

একটু অপেক্ষা কর।

ফলমন একটা শালগাছের সামনে তার ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গাছের উল্টোদিকে গিয়ে আত্মগোপন করল।

কিছু পরে আওয়াজ এলো,—তৈরী অ্যানা।

মুহূর্তে গর্জে উঠল অ্যানার বন্দুক।

একটা ভারী কিছু মাটিতে পড়ার শব্দ হল। তারপর চিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ…

আর দাঁড়াল না সেখানে অ্যানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল গাড়ির দিকে।

ইতিমধ্যে সে তার বন্দুকে গুলি ভরে নিয়েছে। কারণ যদিও সে জানে ফলমনের বন্দুকে আর গুলি নেই তবুও আহত ফলমন ভয়াবহ।

সাবধানে কাছে গিয়ে দেখল, ফলমনের ঘোড়াটাই মাটি নিয়েছে, ফলমন নেই সেখানে। শাল জঙ্গলের ভেতর কোথাও নিঃশব্দে সে সরে পড়েছে!

অ্যানা হাসল মনে মনে। কাপুরুষ ঘোড়ার বিনিময়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে।

ফিরল অ্যানা কুঠিতে। গভীর রাতে প্রায় টলতে টলতেই ফিরে এলো সে। বারান্দা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে মৈত্রেয়ী। ভয়ে ভাবনায় সে তখন প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল।

পালাল মেরী, কাপুরুষটা রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে পালাল। একটা ঘোড়ার বিনিময়ে আজ প্রাণটা বাঁচিয়ে পালিয়েছে সে।

এরপর ফলমন মিলল রাজা দুর্লভ রায়ের সঙ্গে। প্রতিশোধ নিতে হবে, অপমানের চরম প্রতিশোধ।

দুর্লভ রায়ও চেয়েছিলেন এমনি একজন সহযোগী। দুজনে এক হল অ্যানা হেপবার্নকে শায়েস্তা করার জন্যে। শুধু বলল না ফলমন মৈত্রেয়ীর কাহিনীটা। সে জানে, এতে দুর্লভ রায়ের বংশের মর্যাদা জড়িয়ে আছে। সেখানে দুর্লভ রায় ক্ষমাহীন।

চলল টাকার খেলা, বসল মিথ্যা প্রচার সমিতির অফিস। রাতারাতি ভালমানুষ বনে গেল নীলকর ফলমন আর রাজা দুর্লভ রায়। খয়রাতি চলল গরীব প্রজাদের ভেতর। সে বছর সমান সমান নীল আর ধান চাষের সুযোগ পেল চাষীরা।

ছড়িয়ে পড়ল কথাটা চারিদিকে। চাষাভুষোরা বোঝে না কোন ফন্দিফিকির। তাদের কাছে প্রচার করা হল, সরকার আইন করেছে এ বছর সমান সমান নীল আর ধান চাষের জন্যে। ফলমন, দুর্লভ রায় আর হেপবার্নদের নীলকুঠিগুলো পাশাপাশি, তাই মিথ্যার ঢেউটা এসে প্রথম ঘা দিল অ্যানা হেপবার্নের জমিদারিতে।

প্রথম গুঞ্জন, পরে সরব প্রতিবাদ।

নায়েব এসে বলল, মেমসাব, প্রজারা সব জমিতে নীল বুনতে চাইছে না।

অ্যানার কানে আগেই কথাটা এসেছিল। তবু সে বলল, কেন চাইছে না নায়েবমশায় ?

দুর্লভ রায় রটিয়েছে সরকার আদ্ধেক ধান আর আদ্ধেক নীলের চাষ করতে এ বছর হুকুম দিয়েছে।

প্রজারা বিশ্বাস করেছে সে কথা ?

ওরা সাধারণ মানুষ, মেমসাব। যেমন নির্বোধ তেমনি হুজুগপ্রিয়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বৃদ্ধ নায়েব।

আমাদের এলাকায় চাষীদের মোড়ল গোলোক মুর্মু না ?

হ্যাঁ, মেমসাব।

ওকে একবার পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে।

নায়েব সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে ডাক দিল অ্যানা।

লাঠিয়াল কতজন আছে আমাদেব ?

সত্তর জন।

আরও কিছু সংগ্রহ করুন নায়েবমশায়।

কিছুক্ষণ মাথা নীচু কবে দাঁড়িয়ে রইল বৃদ্ধ নায়েব। পরে বলল, —কিছু মনে করবেন না মেমসাব, এ বিষয়ে একটি কথা বলার যদি অনুমতি দেন।

বলুন।

আপনার শ্রদ্ধেয় পিতার সময় থেকে এ কুঠির দায়িত্ব আমাকে দিয়ে এসেছেন। আজ সারা দেশের সাধারণ মানুষের মুখে ওডেন সাহেবের নীলকুঠির নাম। [illegible] লেঠেল, বন্দুক রেখেছি বটে, কিন্তু কোনদিন প্রজার সঙ্গে বিবাদে নামিনি। এতদিন পরে যদি একটা দাঙ্গায় নামি, তাহলে কি সেটা শুভ হবে বলে মনে করেন ?

রেগে বলল অ্যানা, আপনিও কিছু মনে কববেন না নায়েবমশায়,

বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি বাড়ে বলে যে প্রবাদ আছে তা কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে খাটছে না।

মাথা নীচু হল নায়েবের।

গরুকে মারলেই সে দুধ দেবে এমন নির্বোধ আর যে হোক আমি নই। তাকে খেতে দিলে তবেই সে আমাদেরও খাওয়াবে। এই সাধারণ নীতি আমাদের জানা আছে বলেই আজ হেপবার্নদের যা কিছু সম্পদ আর সম্মান।

একটু থেমে বলল অ্যানা, আমার পরিকল্পনা আপনি সঠিক অনুমান করতে পারেননি।

অ্যানার মুখের দিকে তাকাল নায়েব।

লড়াইটা আমাদের প্রজাদের সঙ্গে নয়, যারা মিথ্যা প্রজা ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের সঙ্গে। আমাদের সুনামকে যারা নষ্ট করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি তৈরী।

আজ থেকেই তাহলে আমি লেঠেল যোগাড়ের চেষ্টা করছি।

কথাটা বলেই নায়েবমশায় নিজের কাজে ফিরে গেলেন। পিছু ডেকে বলল অ্যানা, এখন একবার গোলোক মুর্মুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

মোড়ল গোলোক মুর্মু হাজির হল ঠিক দুপুরে। ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছে সে। যা রোদ্দুর পড়েছে এবার!

অ্যানাকে দেখে নত হয়ে প্রণাম করল।

মুর্মু, বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছে তো?

আপনার দয়ায় মেমসাব খবর সব ভাল।

তোমার স্ত্রীর কি যেন অসুখ করেছিল, কাছারি থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে সেদিন, কই আর কোন খবর তো দিয়ে যাওনি?

আপনার দয়ায় সে এখন ভাল আছে মেমসাব।

হামিদ কাজকর্ম করছে কেমন?

গোলোক মুর্মু খানিক সময় চুপ করে থেকে বলল, আজকাল ওর মেজাজ একটু বিগড়েছে মেমসাব।

উৎসুক হয়ে উঠল অ্যানা,—কি রকম ?

ও সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে তোমরা নীল বুনবে না। সরকার বাহাদুর ধান বুনতে বলেছে। আদ্ধেক নীল, আদ্ধেক ধান। অনেক চাষী ওর কথায় কোন কোন নীলের জমিতে ধান বুনবে বলে মনস্থ করে বসে আছে।

আমার এলাকার কত চাষী এমন আশা করেছে ?

এখনও আদ্ধেক হয়নি, কিন্তু মেমসাব, দিনে দিনে ওদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

আচ্ছা মুর্মু, ফার্গুসন সাহেবের কয়েদ থেকে বাবা যেদিন তোমাকে খালাস করে আনল, সেদিনের কথা তোমার মনে আছে ?

ওডেন সাহেব ভগবান মেমসাব।

তাহলে এখনও তুমি হামিদকে সইছ কি করে! তুমি কি জান না, হামিদ রাজা দুর্লভ রায়ের কাছ থেকে টাকা পেয়ে এমন সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমারও তাই মনে হয়েছে মেমসাব।

মুর্মু, আমি জানি এখনও তুমি লাঠি ধরলে একাই পাঁচশো লোককে ঘায়েল করতে পার ; আমি তোমার সাহায্য চাই এ সময়।

প্রাণ দিয়ে আমি লড়ব মেমসাব।

তার আগে একটি কথা,—অ্যানা বলল, তুমি প্রতিটি কৃষকের বাড়ি গিয়ে গোপনে বলবে, শুধু এ বছর নয়, প্রতিবছরই আমার জমিতে নীলের বদলে আমি ধান চাষের অনুমতি দেব।

এ কি শুনছি মা!

মুর্মু, ওডেন সাহেবের মেয়ে মিছে কথা বলে না।

কান্নায় ভেঙে পড়ল গোলোক মুর্মু। বিশাল দেহটা তার ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। এতদিনের দাসত্ব তাদের ঘুচবে সে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না। কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হল সে।

অ্যানা বলল, এখন একটি কাজ করতে হবে মোড়ল।

কি কাজ মা ?

খবব পেলাম আসছে রোববার আমাদের কুঠি ওরা আক্রমণ করবে।

আমরা লড়াই করে প্রাণ দেব।

হাসল অ্যানা,—বোকার মত মরে তো কোন লাভ নেই। তাছাড়া ওরা দলে অনেক ভারী।

তাহলে কি পড়ে পড়ে মার খাব ?

না, তা আমি বলি না, তবে বুদ্ধির ফাঁদে ওদের ফেলতে হবে মুর্মু।

সে বুদ্ধি তো আমি দিতে পারব না মা। আমি একেবারে মুখ্যু।

একটি গোপন পরামর্শ হল অ্যানা হেপবার্ন আর গোলোক মুর্মুর ভেতর। আলোচনার শেষে মুর্মুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাত নেই দিন নেই গোলোক ঘুরল প্রজাদের ঘরে ঘরে। গোপন পরামর্শ হল তাদের ভেতর। একসঙ্গে জড়ো হয়ে ডাকল ওরা হামিদকে।

কি মোড়ল, আমাকে ডেকেছ নাকি ?

গোলোক বলল, ভাই, তুমি হচ্ছ বুদ্ধিমান লোক। আমাদের গায়ে আছে বল, আর তোমার বল হল মগজে।

সকলে মাথা নেড়ে সায় দিতে লাগল।

আসল কথাটা কি বল দেখি মোড়ল ?

আমরা সকলে পিতিজ্ঞে করেছি নীল আর চষবই না ; আধাআধিও না।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল হামিদের মুখ। তবু একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ও মোড়লের মুখের দিকে।

মোড়ল নির্বিকার, চোখে মুখে নির্বোধের সারল্য। হামিদ বুঝল, সন্দেহের কিছু নেই।

তা বাসী হলে কথাটা মিষ্টি হয় মোড়ল। আমি তোমাদের কতদিন থেকেই না বলছি, ওডেনের নীলকুঠির মায়া ছাড়। বাইরে ওদের মিঠে, ভেতরে বিষের কারবার।

তাইতো তোমাকে ডাকলাম বুদ্ধি দিতে গো হামিদ ভায়া। আমি গিয়েছিলাম দরবার করতে। তা মেমসাব বলল, যেখানে খুশি যাও, আমার জায়গায় থাকলে কেবল নীল চাষই করতে হবে।

হামিদ চেঁচিয়ে উঠল,—এখনও বসে আছ এখানে তোমরা। ঐ কুঠিটাকে তুলে নদীর জলে ডুবিয়ে দিতে পারনি!

সকলে চেঁচিয়ে বলল, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

হামিদ এখন একাই একশো।

বলল, আজ সাঁজে আমি আমাদের জোয়ানদের নিয়ে যাব রাজার গড়ে। কাল ভোরে ইকবালপুব, গোপীবল্লভপুর, লোহাদা থেকে সব লেঠেলরা আসবে। তারপর পরশু সবাই মিলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব নীলকুঠির ওপব। এতদিন যা আমাদের ঠকিয়েছে, কড়ায়গণ্ডায় তার শোধ তুলে নেব।

চেঁচিয়ে উঠল সবাই,—আমরা আদায় করে নেব, আমরা নীল চাষ আর করব না।

দলে দলে লড়িয়ে মানুষেরা রাতের অন্ধকারে চলল হিরণ্যগড়ের দিকে। হামিদ আগেই খবরটা দিয়ে এসেছিল দুর্লভ বায়কে। বকশিশও মিলেছে তার প্রচুর।

সবাই সমবেত হল। দুর্লভ রায় আর ফলমন যুক্তি করে গোলোক মুর্মুকে করে দিল দলের নেতা।

ফলমনকে হেসে বললেন দুর্লভ রায়, দুধ খাইয়ে যে কালসাপ পোষে, সাপটা তাকেই ছোবল মারে আগে। গোলোক মুর্মু সেই কালকেউটে।

সব আয়োজন শেষ হল। লাঠি, সড়কি, তীরধনুক, সবশেষে বন্দুক। কথা হল, বন্দুকের কাজ আগে চলবে না দরকার হলে চালান হবে গুলি।

মুর্মু বলল, এক কাজ করি রাজা বাহাদুর, আমার দলের যত মরদ, আরও কিছু এদিককার লেঠেল নিয়ে আমি আগেভাগে চলে যাই

কুঠিতে। বলব গিয়ে, একটা দাঙ্গার ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে, তাই চলে এলাম খবর পেয়ে। কুঠি তো আমাদের আগলাতে হবে।

তারপর যখন লাল নিশান দেখাব, তখন বুঝবে সব ক'টাকে বেঁধে ফেলেছি আমরা। সেই সুযোগে নদী পার হয়ে চলে এসো তোমরা। সামনাসামনি নদী পেরিয়ে চড়াও হতে গেলে মার খেয়ে মরতে হবে সব্বাইকে।

মুর্মুর যুক্তিটা মনে ধরল সবার। ওডেনের নীলকুঠি বেশ সুরক্ষিত জায়গাতেই গড়ে উঠেছিল। একদিকে সুবর্ণরেখা নদী, অন্যদিকে উঁচু থেকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে বিরাট লাল-কালো পাথরের প্রান্তর। মাঝে মাঝে বিশাল বনস্পতিরা শাখাবাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে। দাঙ্গা-কারীকে হটিয়ে দেবার এমন সুবিধাজনক জায়গা এ তল্লাটে আর কারো ছিল না।

মুর্মু চলে গেল দলবল নিয়ে ওডেনের কুঠিতে। নিজের দল ছাড়া বাছাইকরা ভাড়াটে লেঠেলদের কয়েকজনকে সে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলল না।

নীলকুঠিতে গিয়ে মুর্মুর কৌশলে বিনা রক্তপাতে বন্দী হল ফলমন আর দুর্লভ রায়ের বাছাই লেঠেলের দল।

পরদিন বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কুঠির গোল-গম্বুজের ওপর থেকে একটা লাল নিশান উড়তে দেখা গেল। দুর্লভ রায় দলবল নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলেন শালজঙ্গলের ভেতর থেকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল দলের অধিকাংশ লেঠেল নদীর জলে। তারা সাঁতরে ওপারে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। দুর্লভ রায়ের লাল ঘোড়াটা সুবর্ণরেখার চরে দুটো পা নীলকুঠির দিকে তুলে ক্রমাগত চিহিঁ-চিঁহিঁ ডাকতে লাগল।

বন্দুকের আওয়াজ। গুলি ছুটেছে। প্রাণফাটা চীৎকার করে দুর্লভ রায়ের ঘোড়াটা পড়ে গেল নদীর চরে। বালি ঝেড়ে উঠলেন দুর্লভ রায়। কুড়িয়ে নিলেন হাতের তলোয়ার। হাঁক দিয়ে জড়ো করতে লাগলেন বাকী সেপাইদের।

মুর্মু গোল-গম্বুজের ভেতর থেকে দুর্লভ রায়কে লক্ষ্য করে ধনুকে তীর জুড়েছিল, অ্যানা থামাল তাকে,—খবরদার, ও কাজ করো না মুর্মু। দরকার হলে আমিই গুলি চালাব। তুমি যাও, নদী পার হচ্ছে যারা তাদের শায়েস্তা কর।

দলের লোকজন নিয়ে ছুটল মুর্মু নদীর তীরে। যারা উঠল তাদের সাহায্য করতে গিয়ে বেঁধে ফেলতে লাগল মুর্মুর দল।

এপার থেকে দুর্লভ রায় সবই দেখছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, চালাও গুলি।

কিন্তু কাদের ওপর গুলি চালাবে সেপাইরা। ততক্ষণে সব একাকার হয়ে গেছে। এপারের লোকেরা মিশে গেছে ওপারের সঙ্গে। গোলমাল উঠেছে ওপারে। যারা সাহায্য করবে তারাই ধরে· বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কুঠিতে। দিশাহারা হয়ে গেছে এপারের লোকেরা।

জীবনে এমন নির্বোধ বনে যাননি কখনো দুর্লভ রায়। সামনে নদী, যাবার পথ বন্ধ। অগত্যা দাঁড়িয়ে মার খাবার চেয়ে মাথা নীচু করে ফিরতে হল রাজা দুর্লভ রায়কে। দাঁতে দাঁত চেপে গোলোক মুর্মুর মুণ্ডপাত করতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বিহ্বল হয়ে পড়লেন অন্য এক চিন্তায়। ফলমনের সঙ্গে পাঠিয়েছেন তিনি ছোট ভাই রাজা রায়কে। রাজা গান নিয়েই থাকে রাত্রিদিন। প্রজা শাসনের ব্যাপারে নেই তার কোন মাথাব্যথা। আর তাছাড়া সে জানে, দাদা দুর্লভ রায় থাকতে কোনদিন ভাবতে হবে-না তাকে বৈষয়িক কোন ভাবনা। দুর্লভ রায় ভালবাসেন তাঁর ভাইকে ; মনে মনে পছন্দ করেন তার বিষয়-নিরাসক্ত আনন্দময় ক্রিয়াকর্ম, কিন্তু মুখে তাঁর পড়ে না মনের ছায়া। সেখানে তিনি কঠোর শাসক।

এই কুঠি আক্রমণের ব্যাপারে প্রথমেই বাধা দিয়েছিল রাজা রায় দাদাকে। কিন্তু এমন তিরস্কৃত হল যে শেষ পর্যন্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রাজা রায়, এই লড়াইয়ে সেও অংশ নেবে।

পরে অবশ্য দাদা নানাভাবে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তার এই উদ্যমকে, কিন্তু কর্ণপাত করেনি রাজা রায় সে কথায়। সাদা

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তলোয়ারখানা কোমরে ঝুলিয়ে সে ফলমনের সঙ্গে গিয়েছিল সন্ধ্যার আবছায়ায় প্রান্তরের দিক থেকে কুঠি আক্রমণ করতে।

দুর্লভ রায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন ভাইয়ের চিন্তায়। কিন্তু কি করবেন, নিরুপায় তিনি। ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায় না প্রান্তরের দিকে। হয় কুঠির মুখোমুখি নদী পার হয়ে যেতে হবে, আর না হয় বহু-দূর নদী বেষ্টন করে যেতে হবে ফলমন সাহেবের এলাকায়। সেখান থেকে স্থলপথে কিছু দূর অতিক্রম করে কুঠির প্রান্তরে এসে আত্মগোপন করে থাকতে হবে গাছের আড়ালে। সন্ধ্যার আবছায়ায় করতে হবে আক্রমণ, তার আগে বের হতে গেলেই কুঠির দিক থেকে খেতে হবে প্রচণ্ড মার।

এদিকে ফলমন আর রাজা রায় কয়েকজন সেপাই নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। বিশাল বট আর অশ্বত্থ গাছগুলি শাখা মেলে লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেছিল তাদের। তিথি কৃষ্ণপক্ষের প্রথমা, চাঁদ উঠবে এক প্রহর পরে। তার আগেই নাগরার ধ্বনি দেবার কথা আছে গোলোক মুর্মুর। অধীর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কানে এসে বাজল না কোন নাগরার ধ্বনি।

ফলমন বলল, কেমন সন্দেহ হচ্ছে আমার। জয়ী হলে শোনা যেত উল্লাসের শব্দ! কিছু একটা ঘটে থাকবে অঘটন।

একটু থেমে বলল, এ অবস্থায় এখানে বেশী সময় অপেক্ষা করা ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না।

রাজা রায় গর্জন করে উঠল,—কাপুরুষের মত পিছু হটতে পারবনা। শেষ দেখে যেতে চাই।

ফলমন বলল, তুমি চেন না কুমার বাহাদুর অ্যানা হেপবার্নকে। তার হাতে পড়লে নিষ্কৃতি মিলবে না।

আরও উত্তেজিত হল রাজা রায়,—রায়বংশের ছেলে মেয়েমানুষ দেখে ডরায় না।

ফলমনের আগেই শিক্ষা হয়েছিল। সে আজ কোনরকমেই

আসতনা এখানে, যদি না গোলোক মুর্মু'কে এতখানি বিশ্বাস করত। সে প্রায় নিশ্চিন্ত ছিল যে গোলোক সফল হবে অ্যানাকে বন্দী করতে। তখন মৈত্রেয়ীকে ঐ মূল্যবান হীরে সহ অপহরণ করতে কোন বেগই পেতে হবে না তার।

কিন্তু আর যাই হোক ফলমন নির্বোধ নয়। প্রাণ বাঁচলে তবে ধন মান। বেকুবের মত নিজেকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবাব কোন ইচ্ছাই নেই তার।

তাই বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল ফলমন, তাহলে থাকুন কুমার বাহাদুর একাই, চাঁদ উঠতে আর বেশী দেরি নেই। আশমানের হুরী এসে আপনার গলায় মালা পরিয়ে দেবে।

কথা শেষ হতে না হতেই বেজে উঠল নাগরা। ফলমনই ঘোড়ার মুখ ফেরাল প্রথমে। জ্বলজ্বল করে চোখ দুটো তাব জ্বলে উঠল। যেন মৈত্রেয়ীর হাতের হীরেটা তার উজ্জ্বল আলো ফেলল ঐ চোখের ওপর।

চীৎকারে প্রান্তব কাঁপিযে ছুটে আসতে লাগল কয়েকজন অশ্বারোহী কুঠির দিকে।

সহসা পেছন থেকে আরও কয়েকজন অশ্বারোহী তাদেব কাছাকাছি এসে গেল।

মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে দেখতে গেল অগ্রবর্তীরা। কিন্তু ততক্ষণে করার কিছু ছিল না তাদের। দম বন্ধ হবার যোগাড়। দড়ির ফাঁসে তাদের প্রায় সকলেই পড়ল আটক।

ফলমন আর রাজা রায় ছিল সবার আগে, বাঁধা গেল না তাদের। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে উধ্বর্শ্বাসে পালাতে লাগল ফলমন নদীর ধার ঘেঁষে। কিন্তু একদিন পালাতে পারলেও আজ আর পারল না সে। গর্জে উঠল বন্দুক শব্দ নিশানা করে। প্রাণফাটা চীৎকারে রাতের অন্ধকারকে খানখান করে ফলমন পড়ে গেল রুক্ষ পাথরের প্রান্তরে। আরোহীবিহীন ঘোড়াটা ডাক দিয়ে উঠল চিঁহিঁ-চিঁ-হিঁ-হিঁ। মনে হল, একটা তীক্ষ্ণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

একদিন একটা ঘোড়ার বিনিময়ে আত্মরক্ষা করেছিল ফলমন আজ ঘোড়াটাই যেন পরিহাসের হাসি হাসতে লাগল।

একটা ছায়ামূর্তি দেখে অস্ত্র তুলতে যাচ্ছিল রাজা রায়, সহসা প্রান্তরের প্রান্ত থেকে চাঁদটা লাফ দিয়ে উঠল। রাজা রায় তলোয়ারখানা নামিয়ে নিল। একটি অশ্বারোহিণী রমণী দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে, হাতে ধরা আছে বন্দুক।

অ্যানা হেপবার্ন ইঙ্গিত করল। সেপাইরা ধৃত আসামীদের নিয়ে চলে গেল কুঠিতে।

তলোয়ার নামিয়ে নিলেন কেন কুমার বাহাদুর ?

মেয়েদের অস্ত্রাঘাত করতে নেই বলে।

কিন্তু মেয়েরা যদি সশস্ত্র হয়ে লড়াইয়ে নামে ?

তা হলেও নয়।

অ্যানা বলল, তাছাড়া আপনার তলোয়ারখানার নাগালের বাইরে রয়েছি আমি, কিন্তু আপনি রয়েছেন আমার বন্দুকের আওতার ভেতর।

ভুল করছেন মিস হেপবার্ন, বন্দুক দেখে ভয়ে তলোয়ার নামায়না রায়বংশের ছেলে।

আঘাত হেনে আপনার সাহসের পরীক্ষা দিন।

বলেইছি তো প্রাণ গেলেও মেয়েদের গায়ে হাত দিতে পারব না।

তাহলে কি মেয়েদের লাঞ্ছনা স্বচক্ষে তদারক করবার জন্যে এসেছিলেন ?

এখন আপনার এলাকায় রয়েছি আমি, খুশিমত কথা বলার অধিকার আপনার আছে।

বন্দুক নামিয়ে নিল অ্যানা। হেসে বলল, ক্ষমা করবেন, আমার এলাকায় যখন এসে পড়েছেন তখন আপনি আমার অতিথি।

কথা বলতে বলতে কাছে সরে এলো অ্যানা। রাজা রায় এই প্রথম মুখোমুখি দেখল অ্যানা হেপবার্নকে। এমন উজ্জ্বল আর দীপ্ত চেহারা কোথাও দেখেছে বলে তার মনে পড়ল না।

অ্যানা ভাবল ভারতীয়ের ভেতর এমন দেহের গঠন সত্যিই দুর্লভ। সাদা ঘোড়ার ওপর বসে ছিল রাজা রায়, তাকে সেই মুহূর্তে মনে হল, কোন দূরাগত অশ্বারোহী, বহুপথ অতিক্রম করে সে যেন এসে পড়েছে কোন পান্থশালার দ্বারে।

আপনি ক্লান্ত কুমার বাহাদুর, যদি আপত্তি না থাকে আসতে পারেন আমার কুঠিতে।

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল কুমার রাজা রায় অ্যানার দিকে।—না, কোন শঠতার চিহ্ন আঁকা নেই সেখানে। বরং আন্তরিকতার একটি ছবি ফুটে উঠেছে।

তবু বলল, আমি আপনার বন্দী, সুতরাং যেখানে নিয়ে যেতে চাইবেন সেখানেই যেতে হবে আমাকে।

করুণ হয়ে উঠল অ্যানার মুখ। বলল, নিজেকে বন্দী বলে ভাবছেন কেন কুমার বাহাদুর! আপনার পথ খোলা রয়েছে, আপনি ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারেন। কেউ আপনার গায়ে আঁচড়ও দেবে না।

রাজা রায় হেসে বলল, চলুন আপনার অতিথিশালাতেই যাই।

ঘোড়া ফেরাল অ্যানা। কালো বলিষ্ঠ ঘোড়ার ওপর বসেছে সে। এই জ্যোৎস্নালোকে আশ্চর্য রহস্যময়ী বলে মনে হল অ্যানাকে।

কালো ঘোড়ার পেছনে অনুসরণ করে চলল সাদা ঘোড়ার সওয়ার।

অ্যানা কুমার বাহাদুরকে নিয়ে কুঠি বেষ্টন করে ঢুকল বাগান-বাড়িতে। বিরাট দুটি ঝাউগাছের ভেতর দিয়ে পাথরবাঁধান পথ। শনশন আওয়াজ উঠছিল ঝাউয়ের থেকে। বাগানের ভেতরে ঢুকেই ঘোড়া থেকে নামল অ্যানা। ফিরে তাকাল কুমার বাহাদুরের দিকে। রাজা রায় ততক্ষণে নেমে পড়েছে। অ্যানা কুমার বাহাদুরের সাদা ঘোড়াটার লাগাম ধরে পাশের একটা গাছে বেঁধে দিতে গেলে বিব্রত হয়ে পড়ল রাজা রায়।

কি করছেন, মিস হেপবার্ন, এ কাজ আপনার সাজে না।

বাঁধতে বাঁধতে মুখ ফিরিয়ে বলল অ্যানা, অনেক কিছুই তো সাজেনা

অনেকের, তবুও করতে হয়। তারপর হেসে বলল, এই যেমন ধরুন আপনার ক্ষেত্রে লড়াইয়ের কাজটা।

পৌরুষে ঘা পড়ল রাজা রায়ের, কিন্তু নিরুপায়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

অ্যানা বুঝল এমন একটা কথা সহসা বলে সে ভাল করেনি। পরিস্থিতিকে লঘু করে দিয়ে বলল, আসুন, বাগানের ভেতরেই বসা যাক।

রাজা রায় চলতে লাগল অ্যানার পাশাপাশি। বাগানের মাঝ দিয়ে পথ। পথের দু'ধারে বিচিত্র সব গাছের সারি। রাজা রায় দাঁড়িয়ে গেল। শ্বেতশুভ্র পাথরে খোদাই ভেনাসের একটি মূর্তি। বেদির নীচে রক্তরঙনের স্তবক। একটি ডাল সবুজ পাতা আর একগুচ্ছ ফুল নিয়ে যেন সৌন্দর্যের দেবীকে অর্ঘ্য দিতে এগিয়ে গেছে কটিতট পর্যন্ত।

তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল রাজা রায়।

ফিরে দাঁড়াল অ্যানা,—আপনি শিল্পী, কুমার বাহাদুর ?

লজ্জিত হল রাজা রায়। এমন বলিষ্ঠ পুরুষের মুখে লজ্জা রমণীয় লাবণ্য এনে দিল। অ্যানা মুগ্ধ হয়ে দেখল সে ছবি।

রাজা রায় বলল, প্রতিটি মানুষ যে কোন ভাবেই হোক শিল্পী। কারো প্রকাশ ঘটে, কারো বা তেমন ঘটে না।

কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে এলো একটা বাঁধান বেদির কাছে।

হাত দেখিয়ে রাজা রায়কে বসতে বলল অ্যানা।

দুজনেই বসল বেদিতে। কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। কারো মুখে কথা নেই।

নীরবতা ভাঙল অ্যানাই,—আচ্ছা কুমার বাহাদুর, একটা কথার উত্তর দেবেন ?

জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাল রাজা রায়।

কি এমন অপরাধ করেছি, যে কারণে আপনারা সবাই মিলে আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন ?

রাজা রায় নীরব। চোখে তার অসহায়ত্বের ছাপ।

অ্যানার গম্ভীর মুখখানা সহসা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তবু

নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, জানি, আপনি এ কথার জবাব দিতে পারবেন না। যাঁরা দিতে পারতেন, তাঁদের একজন ফিরে গেছেন হিরণ্যগড়ে, আর অন্যজন সম্ভবতঃ নীলকুঠির প্রান্তরে নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

পরাজয়ের গ্লানির ভেতরেও মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে উঠল রাজা রায়ের মন। দাদা ফিরে গেছেন হিরণ্যগড়ে, এই শুভ সংবাদটা তার মনকে অনেকখানি ভারমুক্ত করে দিল।

কুঠির দিক থেকে একটা গোলমাল উঠল। অ্যানা বলল, একটু অপেক্ষা করবেন কি কুমার বাহাদুর ? আমি এখুনি ফিরে আসছি।

রাজা রায় সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। অ্যানা দ্রুতপায়ে চলে গেল কুঠিবাড়ির দিকে।

ঘোড়াটা পা ঠুকছে রাজা রায়ের। এই মুহূর্তে চারদিক বড় নির্জন!

বাগান থেকে দেখা যাচ্ছে ফাঁকা প্রান্তর। বড় বড় গাছগুলো দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। বাধাহীন পথ প্রান্তর। দূর থেকে ভেসে এলো একটা দমকা হাওয়া। বয়ে গেল রাজা রায়ের অবিন্যস্ত চুলগুলো উড়িয়ে দিয়ে।

চারদিকে যেন চলে যাওয়াব ইঙ্গিত।

রাজা রায় চিন্তার বাশ টানল।

এতদিনে বুঝল, বাধা থাকলেই বাধা ভেঙে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু বাধা সরিয়ে নিলে তখন আর ইচ্ছে করলেই চলে যাওয়া যায় না।

কতক্ষণ পরে ফিরে এলো অ্যানা হেপবার্ন। মুখে চিন্তার রেখা। কিছুক্ষণ আগে ফলমনকে গুলি কবেও যে মেয়ে আশ্চর্যভাবে নিজেকে ঢেকে রেখে হেসে কথা বলেছে, তার মুখে সহসা চিন্তার ছায়া পড়তে দেখে বিচলিত হল রাজা রায়। তখনও গোলমালের আওয়াজ আসছিল নদীর দিক থেকে।

অ্যানা বলল, হিরণ্যগড়ের সম্মান রক্ষার জন্যে রাজা বাহাদুর নদীর ওপারে লোকলস্কর নিয়ে জড়ো হয়েছেন।

কে, দাদা! আমি এখুনি গিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করছি।

কিছুক্ষণ রাজা রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে অ্যানা বলল, এত সহজে আপনাকে জয় করে ফেললাম কুমার বাহাদুর, মনে হচ্ছে দশটা লড়াই জেতার চেয়ে এর দাম অনেক বেশী।

রাজা রায় অ্যানার ব্যবহারে যথার্থই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিল। তবে এতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ঠিক হয়নি ভেবে নীরব হয়ে রইল।

একটু থেমে অ্যানা বলল, আপনাকে ডেকে এনে আতিথ্য দিতে পারলাম না, সেজন্যে ক্ষমা করবেন। এখুনি আমার সঙ্গে চলে আসতে হবে কুমার বাহাদুর।

রাজা রায় উঠল। চলতে লাগল, যেখানে ঘোড়া বাঁধা ছিল সেই দিকে।

অ্যানা বলল, না, ঘোড়ার আর প্রয়োজন হবে না এখন। আমি যথাসময়ে ওকে পেঁৗছে দেব আপনার গড়ে, এখন আপনাকেই যেতে হবে।

অ্যানাকে অনুসরণ করে উঁচুনীচু বাগানের পথ পেরিয়ে রাজা রায় এসে দাঁড়াল এক সুড়ঙ্গের কাছে। অ্যানা জ্বালল মোমের বাতি। বলল, নেমে আসুন আমার সঙ্গে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল অ্যানা, পেছনে সংশয়ে নির্ব্বাক রাজা রায়।

একসময় সিঁড়ি শেষ হল এসে নদীর কূলে। সেখানে বহুদিনের একটি গাছ লতাপাতায় স্থানটিকে আবৃত করে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি মানুষকে সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসতে দেখে নিশাচর পাখিরা শব্দ করে পাখা ঝাপটে উড়ে গেল।

অ্যানা বলল, উঠে আসুন নৌকোয়।

রাজা রায় সাবধানে নৌকোয় গিয়ে বসল। স্রোতের টানে ভেসে চলল নৌকোখানা।

এতক্ষণে কথা বলল রাজা রায়, কোথায় চলেছি আমরা?

হিরণ্যগড়।

আপনি দেখছি ভীষণ দুঃসাহসী,—রাজা রায়ের গলায় বিস্ময়ের সুর।

কেন, গড়ে পেঁৗছলে বেঁধে ফেলবেন নাকি আমাকে?

রাজা রায়ের রক্তে আচমকা দোলা লাগল। এমন করে যে কথা বলতে পারে, ইচ্ছে করলেই কি তাকে বাঁধা যায়।

রাজা রায় বলল, আপনি নিজে বাঁধন মেনে না নিলে আপনাকে বাঁধা কারো পক্ষেই সহজ হবে বলে মনে হয় না।

হাসল অ্যানা,—আপনাদের এই বিশ্বাসই আমার শক্তি।

কাছাকাছি এসে গেল ওরা হিরণ্যগড়ের। নদীতীরে শালজঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে গড়ের রাস্তা চলে গেছে। অগণিত দেবালয় আর গৃহের উর্ধ্বমুখী চূড়াগুলি দেখা যাচ্ছে। অতীতের সে বৈভব আজ আর নেই হিরণ্যগড়ের, কিন্তু এই অট্টালিকাশ্রেণী সেই বিগত মহিমার সাক্ষ্য-বাহী হয়ে আছে।

ঘাটের কাছে এসে নৌকো বাঁধল অ্যানা। এবার নেমে যাওয়ার পালা কুমার বাহাদুরের।

রাজা রায় ঘাটে নামতে গিয়ে বলল, একদিন এই ঘাটে আপনাকে আমার অতিথি হয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানাতে পারি কি মিস হেপবার্ন?

অ্যানা হেসে বলল, আসতে পারি, তবে যদি এটা নিছক সৌজন্যমূলক আমন্ত্রণ না হয়।

হাসল রাজা রায়। বলল, এ ঘাট থেকে বিশ বিঘে জমি আমার বাগানের এলাকা। এখানে আপনার অবারিত দ্বার; আর আন্তরিক আমন্ত্রণ রইল সবসময়ই।

অ্যানা বলল, আসব।

দয়া করে জানাবেন কি সে শুভদিনটি কবে আসবে?

একটু ভেবে অ্যানা বলল, আগামী সপ্তাহের শেষ দিনে, যখন ঠিক অন্ধকার কেটে গিয়ে চাঁদ উঠবে বনের আড়ালে।

আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্যে এই ঘাটে।

অ্যানার নৌকো উজান ঠেলে চলল কুঠির দিকে। রাজা রায় ছুটল ঘোড়ার সন্ধানে। এখুনি গিয়ে নিবৃত্ত করতে হবে তার দাদাকে। সে বিলক্ষণ জানে, দুর্লভ রায় যে সাপের ছোবল খায়, তাকে আগে মেরে তবে মরে।

ঘোড়া নিয়ে বের হবার আগে সে একবার ছুটল অন্দরমহলে।

রানী বিলাসবতী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবী চণ্ডিকার মন্দিরের সামনে। রাজা রায়ের পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

কোথা ছিলে তুমি ঠাকুরপো! ওদিকে তোমার দাদা তোমাকে উদ্ধার করে আনতে পাগলের মত ছুটেছে।

এখন কান্নার সময় নয় বৌঠান,—রাজা রায় প্রবোধ দিল বৌদিকে। এখন আমি দাদার খোঁজেই চললাম। যে রকম একরোখা মানুষ—নিজের বিপদই না ডেকে আনেন!

বিলাসবতী বাধা দিয়ে বললেন, তোমার যাওয়া হবে না কিছুতেই। যে দুর্ভাবনায় ফেলেছিলে তুমি আমাদের, সারাটা দিন পাগলের মত ঘর বার করেছি।

কথা দিচ্ছি বৌঠান নদীর ওপারে আমি যাব না। শুধু দাদাকে খবরটা দেব যে আমার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি।

বিলাসবতী দেবরকে গা ছুঁয়ে শপথ করিয়ে নিলেন, যেন লড়াইয়ে আর কেউ জড়িয়ে না পড়ে। নিঃসন্তান রানী দেবরকে স্নেহ করেন সন্তানের মত। এদিকে গোপন পরামর্শ, পরিহাস রসিকতা সবকিছু চলে তার সঙ্গে।

রাজা রায় বেরিয়ে গেল। রানী বিলাসবতী উঠে এলেন ছাদের ওপর। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে দেবর রাজা রায়। আর অদূরে শালজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে অগণিত মশালের ঝিলিমিলি আলো।

মাঝ রাতের ঘণ্টা বেজে গেছে তখন। ঘোড়ার খুরের শব্দে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন রানী বিলাসবতী। দেখলেন, দুই ভাই নামল ঘোড়া থেকে। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে।

কথা হচ্ছিল এর কয়েকদিন পরে।

দুই ভাই বসে ছিল পাশাপাশি; রানী বিলাসবতী করছিলেন জলযোগের আয়োজন।

দুর্লভ রায় বললেন, এই ইংরাজ জাতটার মত কূট-কৌশলী আমি আর দেখিনি।

এঁ কথা বলছ কেন দাদা,—বলল রাজা রায়, তুমিই না ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলে হেপবার্নকে শায়েস্তা করবার জন্যে?

আমি ভেবেছিলাম, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব, কিন্তু এখন দেখছি দ্বিতীয় কাঁটাখানাও পায়ে ফুটল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিলাসবতী। স্বামীর কথা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম?

মুখ তুললেন দুর্লভ রায়।

বললেন, ফলমনের মৃত্যুর জন্যে প্রায় সব ক'টা নীলকর সাহেব আমাকেই দায়ী করছে। ওরা বলছে, ফলমনকে হেপবার্নের দিকে লেলিয়ে দিয়ে পেছন থেকে আমরাই নাকি ওকে গুলি করেছি।

এ ধারণা ওদের হল কি করে?—জিজ্ঞেস করল রাজা রায়।

লাশটা ওরা যোগাড় করেছিল পরের দিন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে গুলি পিঠের দিকেই লেগেছিল প্রথম।

তাতে কি প্রমাণিত হয়?

দুর্লভ রায় বললেন, আমরা ওকে এগিয়ে দিয়ে পেছন থেকে গুলি করেছি।

এমনও তো হতে পারে, পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে পড়েছে,—বললেন বিলাসবতী।

আর এ কথাটাই তো যথার্থ সত্য,—বলল রাজা রায়।

দুর্লভ রায় বললেন, ইংরাজরা সত্য জানলেও কথাটা স্বীকার করতে চায় না। তাদের মতে সাদাচামড়ার লোকেরা বীরের জাত, পিছু হটতে জানে না।

কিন্তু একটা কথা, প্রশ্ন তুলল রাজা রায়,—ফলমনকে মেরে আমাদের স্বার্থ?

ওরা অনেক বেশী বুদ্ধিধর রাজা। আমাদের হেপবার্নের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে ওরা দূরে থেকে হেপবার্নদের শক্তির পরিমাণটা দেখছিল। এখন যেই বুঝল, হেপবার্নকে ঘায়েল করা সোজা নয়, তখন ভিড়ল ওরই পক্ষে। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আমি হয়ে গেলাম শত্রু।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমার প্রশ্নটা ভিন্ন। আমরা ফলমনকে মারব কোন্ স্বার্থে?

ওরা আদালতে বলেছে, নিরীহ ফলমনকে উত্তেজিত করে লাগিয়েছি আমরা হেপবার্নের বিরুদ্ধে। তারপর গুলি করে মেরেছি তাকে। আমাদের নাকি উদ্দেশ্য ছিল, ফলমনের মৃত্যুর খবর পেলে নীলকর সাহেবরা একসঙ্গে হেপবার্নের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিলাসবতী চিন্তিত মুখে বললেন, তাহলে আদালত শুরু হয়ে গেছে?

বললেন দুর্লভ রায়, শুরু করতে ওদের খুব বেশী একটা দেরি লাগে না, কারণ বিচারকদের অধিকাংশই ওদের জাতভাই।

উত্তেজিত হয়ে উঠল রাজা রায়,—বিচার তো সত্য-মিথ্যাকে নিয়েই হবে। সেখানে এদেশী বিদেশী বলে তো কথা নেই।

এ তোমার গানের জগৎ নয় রাজা! এ হল আর এক জগৎ। এখানে সত্য-মিথ্যা পাশাপাশি এমন মিলে মিশে থাকে, যার থেকে একটিকে পৃথক করা প্রায় দুরূহ।

দাদার কথাটা যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না রাজা রায়। মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, এ কেমন করে হয়!

দুর্লভ রায় বললেন, দেখনি তো কোনদিন আদালতের চেহারা, তাই এমন অবিশ্বাসের মাথা-নাড়া দিতে পারলে, দেখলে সব বিশ্বাসই কোথায় উবে যেত।

একটু থেমে বললেন, একদিন আদালতে কাজে গিয়ে দেখি, আমার আগে একটি বিচারের নিষ্পত্তি হচ্ছে। বসে বসে দেখতে লাগলাম।

কোন অঞ্চলের প্রজারা এক অত্যাচারী নীলকরকে অভিযুক্ত করেছে আদালতে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সেই নীলকর যেহেতু সাহেব

সেজন্যে আসামী হয়েও বসার আসন পেয়েছে বিচারকের ঠিক পাশেই। আদালতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছোটখাট রঙ্গরসিকতাও হচ্ছে তাদের ভেতর। এতে তুমি সুবিচারের কি করে আশা করতে পার রাজা?

রাজা রায় যেন চিন্তিত হল। তার এতদিনের একটা ধারণা ছিল যে আর যা হোক আদালতের বিচারক বিচারের নামে অন্ততঃ পক্ষপাতিত্ব করবে না।

স্পষ্টবাদিতার দুর্লভ শক্তি ছিল বিলাসবতীর। অনেক সময় তা রাজা দুর্লভ রায়ের শঙ্কার কারণ হত। হঠাৎ বলে বসলেন তিনি, কিন্তু আর যাই বল, অন্যায় তোমরাও কিছু কম করনি।

কি রকম?—মাথা তুললেন দুর্লভ রায়।

কেন, একটা নিরীহ মেয়েকে তোমরা শাস্তি দিতে যাওনি?

তুমি ওকে চেন না, হেপবার্ন নিরীহ মেয়ে!—হাসলেন দুর্লভ রায়।

জেদ ছাড়লেন না বানী,—আমাকে বুঝিয়ে দাও সে কি অন্যায় করেছে?

দুর্লভ রায় দৃঢ়ভাবে বললেন, তার প্রথম অন্যায় সে বিদেশী; আব দ্বিতীয় অন্যায়, সে আমাদেরই বিষয়ের ওপব আজ রাজত্ব করছে।

এ হল তোমার রাগের কথা,—বললেন বিলাসবতী, তুমি বিপদে পড়েই ওডেন সাহেবকে বিক্রি করেছ তোমার সম্পত্তি।

তা না হয় হল, কিন্তু আমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে সে অনেক কম দামেই কিনেছে আমার জমিগুলো।

আর তাই তার চলে যাবার পর তুমিও তার মেয়ের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আক্রমণ করতে গিয়েছিলে। অন্যায় দু'পক্ষেরই আছে জেনো।

রাজা রায় বুঝল বৌঠানের কাছে দাদার আজ নিষ্কৃতি নেই, তাই হেসে বলল, এবার কি তাহলে জমিদারি দেখার কাজ বৌঠানের ওপর পড়বে নাকি?

বিলাসবতী বললেন, তুমিই বল ভাই, দোষীর শাস্তি কি আর একজন দোষী দিতে পারে?

এই এক জায়গাতেই হার মানেন রাজা দুর্লভ রায়। বিলাসবতীকে রূঢ় কথা বলার কোন সাহসই তিনি কোনদিন অর্জন করতে পারেননি।

অনেক চিন্তা করে দুর্লভ রায় বললেন, সবই ভাগ্য, বুঝলে; আজ যদি বংশের লক্ষ্মী সেই হীরকাঙ্গুরীয় থাকত, তাহলে সব দিক থেকে এমন ভাগ্যের বিপর্যয় নেমে আসত না।

এই সামান্য কথায় কাজ হল। গম্ভীর হয়ে গেলেন রানী বিলাসবতী। ততোধিক বিষণ্ণ হল ছোটকুমার রাজা রায়।

ঝিঁঝিঁ ডাকছে, তার সঙ্গে বিচিত্র সব নিশাচর কীট-পতঙ্গেরা সুর মিলিয়েছে। দূরে নদীতীরে শেয়ালেরা ডেকে গেল। পাখা ঝাপটাচ্ছে একরাশ বাদুড়। রাজা রায় অধীর আগ্রহে পায়চারি করছে। ছলছল কলকল শব্দে সুবর্ণরেখার জলধারা ভেঙে পড়ছে শানবাঁধান পাথরের ঘাটে।

রাজা রায় থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল পুবদিকে। চাঁদ উঠতে আর কত বাকী।

ধীরে ধীরে মনে হল আলোর একটা রেখা অরণ্যশীর্ষে দেখা দিয়েছে। রাজা রায়ের চোখের পলক পড়ছে না। সেই রেখাটি ক্রমে আলোর এক রাগিণীতে রূপান্তরিত হল। সুর ভাঁজতে লাগল রাজা রায়। মনে হল, এই তরঙ্গিত অন্ধকারের প্রবাহে ভেসে আসছে একটি আলোর তরণী।

চন্দ্রোদয় সম্পূর্ণ হল; রাজা রায় মগ্ন হয়ে গেছে সুরের জগতে। সুর যখন থামল তখন পেছন ফিরে চমকে উঠল কুমার বাহাদুর।

তুমি!—ক্ষমা করবেন মিস হেপবার্ন,—প্রথম সম্বোধন করেই সংকুচিত হয়ে পড়ল রাজা রায়।

দেখছি খুব সহজেই আপনি পরকে আপন করে নিতে পারেন,—হেসে বলল অ্যানা হেপবার্ন।

গানের ভেতর ডুবে ছিলাম এতক্ষণ, তাই বুঝে উঠতে পারিনি আপনার উপস্থিতি, সেজন্যে দ্বিতীয়বার মাপ চাইছি।

এ আমার অতিরিক্ত লাভ কুমার বাহাদুর। লক্ষ্ণৌতে থাকতে খুব ছোটবেলায় আমি এমনি ভারতীয় গান শুনেছিলাম।

সংগীতে আপনার আগ্রহ আছে দেখছি!

মা ছিলেন সংগীতের বিশেষ অনুরাগিণী। তাঁর কাছ থেকেই সুরের জগতে ঢোকার পথটুকু জেনে নিয়েছিলাম।

রাজা রায় উল্লসিত হয়ে উঠল,—প্রথম দেখাতেই আপনাকে আমার শিল্পী বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু ঠিক তার পরেই···

কথাটা শেষ করল অ্যানা, আমাকে আপনি বন্দুক ছুঁড়তে দেখলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ধারণার পরিবর্তন ঘটল?

মনের সে পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি মিস হেপবার্ন।

আমি অ্যানা।

এবার থেকে তাহলে ঐ নামেই ডাকব আপনাকে।

খুশী হব তাহলে অনেক বেশী।

চলুন আমার বাগানবাড়িতে।

আজ আমি আপনার অতিথি, সুতরাং যেখানে খুশী নিয়ে যাবার ভার আপনার।

রাজা রায় পথ দেখিয়ে চলল আগে আগে। স্বল্প আলোকে পাথরবাঁধানো পথের ওপর দিয়ে অ্যানা চলল কুমার বাহাদুরকে অনুসরণ করে।

ডানদিকে একটি ঝিল। অজস্র শ্বেত আর রক্তবর্ণের কুমুদ ফুটে আছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় স্থানটিকে বেশ রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল। ঝিলের একদিকে তালের সারি মাথা উঁচু করে ছত্রাকার পাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি বাঁক ঘুরেই অ্যানা দেখল সেই ঝিলটিই প্রসারিত হয়ে গেছে। থমকে দাঁড়াল ও। ঝিলের মাঝে একটি দ্বীপ, আর সেই দ্বীপের ওপর একটি ছোট্ট দ্বিতল গৃহ। সম্ভবতঃ আলো জ্বলছিল বাড়িটির ভেতর, তার প্রতিবিম্ব তারার মত ঝলমল করছিল ঝিলের জলে। মুগ্ধ চোখে সেই অপরূপ জলমহলের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যানা।

রাজা রায় বলল, ঐটিই আমার জলসাঘর। যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমরা যেতে পারি ওখানে।

আপত্তি কেন থাকবে কুমার বাহাদুর! যে কোন মানুষের পক্ষে স্থানটি রমণীয়। শিল্পীর পক্ষে তো স্বর্গোদ্যান!

যখন পছন্দই হয়েছে আপনার তখন চলুন যাই আমরা।

শুধু কি পছন্দ, ঈর্ষা হচ্ছে আপনার এই সৌভাগ্যে।

হাসল রাজা রায়। বলল, আর একটু এগিয়ে চলুন, ঘাটে বাঁধা আছে পারাপারের নৌকো।

দুজনে এসে পৌঁছল ঝিলের ঘাটে। একটি ছোট্ট সুসজ্জিত নৌকোতে উঠল রাজা রায়। হাত ধরে তুলল অ্যানা হেপবার্নকে।

অ্যানা হেপবার্ন দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের তলায় পার্সিয়ান কার্পেটে বিচিত্র রঙ আর ফুলপাতার নকশা। ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন। বেলোয়ারী কাঁচগুলো সাতরঙের ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করছে। সাজান রয়েছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। তন্ময় হয়ে দেখছে অ্যানা। মনে হল, সুরের একটা ঢেউ উঠল। প্রতিটি যন্ত্র বাজছে! ঐ সুরগুলো বাতাসে ভর করে নেমে যাচ্ছে নিথর শীতল ঝিলের জলে। এবার ঝিলে জাগল ঢেউয়ের জল-বলয়। কতদূর চলে গেল সেগুলি কাঁপতে কাঁপতে।

সে কি, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন?—পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল রাজা রায়, বেরিয়ে আসতে আসতে বলল।

ভাল লাগছে কুমার বাহাদুর।

কি ভাল লাগছে অ্যানা?

সবকিছু! তারপর কথাটা মুহূর্তে ঘুরিয়ে নিল হেপবার্ন; মৃদু হেসে বলল, এই যে আপনি কোন সংকোচ না করে নাম ধরে ডাকলেন।

খুশী হল রাজা রায়।

সাহস করে একটি কথা বলব আপনাকে?

বলুন,—অ্যানা বলল, কথা বলায় সংকোচ থাকবে কেন?

আপনি আমাকে রাজা বলেই ডাকবেন, যদিও আমি নামে মাত্র রাজা।

দুজনেই হেসে উঠল।

অ্যানা বলল, আপনি শুধু রাজা নন, সুরের রাজা।

সেদিন গান হল, কথা হল; রাজা রায় অ্যানা হেপবার্নের আরও নিকটে এলো।

ফিরে যাবার সময় অ্যানা দেখল, রাজা রায়ের গৃহের দক্ষিণ অলিন্দে একটি প্রস্তরমূর্তি,—প্রেমিকার মুখ দক্ষিণ করে তুলে ধরে দেখছে মুগ্ধ প্রেমিক।

চোখ ফিরিয়ে নিল অ্যানা। দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। ধরা পড়ে গেল নাকি সে রাজা রায়ের কাছে! ভয়ে কাঁপতে লাগল অ্যানার বুক।

নৌকো বাইতে বাইতে রাজা রায় বলল, আবার কবে দেখা হবে অ্যানা?

শত্রুপক্ষীয়দের ঘনঘন দেখা হওয়া কি খুব মঙ্গলের রাজা?

সুরের জগতে শত্রুমিত্রের ভেদাভেদ আছে কি?

অ্যানা বলল, তার আগে বল, প্রথমে শত্রুতা দিয়ে পরিচয়টা শুরু হলে, পরে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হয় নাকি?

রাজা রায় মাথা নেড়ে স্বীকার করল সে কথা।

তোমাকে আজকাল অন্যমনস্ক দেখছি কেন দিদি?—অ্যানাকে জিজ্ঞেস করল মৈত্রেয়ী।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সুবর্ণরেখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল অ্যানা। চমক ভাঙল তার মৈত্রেয়ীর কথায়।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে মৈত্রেয়ীর দিকে। সংশয় জাগল মনে,—ধরা পড়ে যাচ্ছে নাকি সে!

মুখের ভাবের পরিবর্তন করে হেসে বলল অ্যানা, কেন, নতুন কিছু তোমার চোখে পড়ছে নাকি?

না, তেমন কিছু নয়, তবে···

বুঝেছি, তোমার চোখে আমি কিছুটা বদলেছি। আচ্ছা, মেরী, আমাদের বাড়ির সামনের ঐ গাছটাকে শীতে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ ?

মৈত্রেয়ী বলল, দেখেছি, কেন বল তো ?

তখন গাছটার সব কটা পাতাই ঝরে গিয়েছিল, তাই না ?

ঠিক তাই।

কিন্তু আজ তার কি রূপ দেখ। অজস্র পাতা ডালে ডালে, ফুল ফুটেছে থোকা থোকা।

অ্যানা এ কথার ভেতর দিয়ে কি বোঝাতে চাইছে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল মৈত্রেয়ী।

অ্যানা বলল, একটা গাছের যদি এই পরিবর্তন হয়, মানুষের পরিবর্তনটা কি তার চেয়েও বেশী হবে না মেরী ?

কিছু মনে করো না দিদি, এমনি মনে হয়েছিল তাই বললাম।

অ্যানাও সহজ হল,—আচ্ছা মেরী, আমাকে তুমি খুব ভালবাস, না ?

একটুও না,—এই বলে খিলখিল করে হেসে উঠল মৈত্রেয়ী।

কি মনে এল অ্যানার। বলল, মেরী, একটা কথা স্পষ্ট করে বলবে আমাকে ?

না ফিরেই মৈত্রেয়ী বলল, কি জানতে চাও বল ?

আচ্ছা মেরী, হিরণ্যগড়ের সঙ্গে আমার এই যে বিবাদ লেগেছে, তুমি এ সম্বন্ধে কি ভাব বল তো ?

বিশেষ কিছুই না।

এ তুমি সত্যকে এড়িয়ে যাচ্ছ মেরী।

কি বললে তুমি খুশী হবে বল ?

খুশী করার কথা নয়, তোমার মনটাকে শুধু জানার কৌতূহল।

হয়তো কোনদিন তোমাকে শত্রু বলেই ভাবতাম দিদি, কিন্তু আজ তাদের চেয়ে তুমি অনেক কাছের মানুষ। হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে পর বলে ভাবতে পারব না।

অ্যানা বলল, আমার প্রশ্নটা কিন্তু আর একটু ভিন্ন রকমের। আচ্ছা, সোজাসুজি বল দেখি, হিরণ্যগড়ের ছোটকুমার যদি লড়াই করতে এগিয়ে আসেন, আর আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই জানালা দিয়ে বন্দুক তাক করি, তাহলে তোমার মনের অবস্থাটা কি হবে ?

জানি না। নত হল মৈত্রেয়ীর মুখ। ঝড়ো হাওয়ায় যেন একরাশ জুঁইফুল ঝিরঝির করে ঝরে পড়ল মৈত্রেয়ীর চোখ থেকে।

তুমি কাঁদছ মেরী !

ছুটি ঠোঁট চেপে রেখে প্রবলভাবে মৈত্রেয়ী মাথা নাড়তে লাগল।

স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ বসে রইল অ্যানা। তাহলে আজও মেরী ভালবাসে রাজাকে! কোন পরিচয় নেই; দেখা, সেও তো শুধু ক্ষণিকের, তবু এরা ভালবাসতে পারে এমন করে। বিয়ের অনুষ্ঠান এদের কাছে এত গভীর, এত বেশী দামী।

আবার নৌকো ভিড়ল রাজা রায়ের জলমহলে।

রাজা রায়কে অনুসরণ করে শ্বেত পাথরেব সিঁড়ি বেয়ে অ্যানা উঠছিল ওপরে। হঠাৎ অ্যানাই নীরবতা ভাঙল, আজ স্রোতের টান বড় প্রখর ছিল রাজা, মনে হল নদী পার হয়ে তোমার এখানে আসা বুঝি আর হল না।

রাজা রায় ফিরে বলল, স্রোতের টানের চেয়ে অন্য কিছু টান নিশ্চয়ই বেশী হয়েছিল তাই আমার ঘাটে তোমায় তরী ভিড়ল।

অ্যানা মৃদু হেসে বলল, তোমার সুরেব সাগর টান দিয়েছে রাজা, তাই সামান্য নদী আর আমায় টেনে রাখতে পারল না।

যেখানে সিঁড়ি শেষ হয়েছে ঠিক সেখানেই মোগল স্থাপত্যের জালি ঘেরা একটি বারান্দা ঝুঁকে আছে ঝিলের প্রসারিত জলের দিকে। তারই ওপর বসার জন্যে একটি সুন্দর বেদী।

রাজা রায় অ্যানাকে তার ওপর বসতে ইঙ্গিত করে নিজে এক প্রান্তে বসল।

তুমি সুরের টানে এসে পড়েছ, তাই না অ্যানা? তোমাকে তাহলে একটি গান দিয়েই অভ্যর্থনা করা যাক্।

ঠুংরির মিঠে টান উঠল রাজা রায়ের সাধা গলায়।

নদীয়া বৈরী হো রাম
সৈঁয়া রহে ওহি পার।
গাহরী নদীয়া নাওয়া পুরাণি
অব ক্যায়সে উতরু পার রে—।

টুকরো টুকরো কথা সুরের পাখায় ভর করে উড়ে ফিরতে লাগল জলসাঘরের চারদিকে। অ্যানা শুনছে। কথাগুলো যেন তার কাছে সৃষ্টি করেছে এক রুদ্ধদ্বার মায়ালোক। সে তার ভেতর প্রবেশের পথ পাচ্ছে না, কিন্তু সুরের নানা অলিন্দ থেকে কে যেন বার বার হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে, এসো, এসো, এসো।

গান থামল, কিন্তু সুর থামল না। সে সুরের ছড়ান প্রজাপতির ঝাঁক অনেক রঙের বাহার দেখিয়ে, অনেক নাচের কসরৎ দেখিয়ে তারপর দূরে দূরে সব মিলিয়ে গেল।

একসময় অ্যানা যেন মধুর একটা স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এসে বলল, তুমি সত্যিই সুরের যাদুকর রাজা!

রাজা রায় অমনি বলল, আমি যদি আজ আমার মাননীয়া অতিথিকে গান শুনিয়ে খুশী করতে পেরে থাকি তাহলে সে কৃতিত্ব শুধু তাঁরই, আমার নয়।

এ কথা কেন বলছ রাজা। তুমি শোনালে গান আর আমি হলাম মুগ্ধ; এতে আমার কৃতিত্ব কোথায়! সবই তো তোমার!

না অ্যানা। আজ তুমি আমার কণ্ঠে গানের কথা তুলে দিয়েছ। ঐ যে তুমি এলে আর বললে তোমার ঐ দুরন্ত নদী পার হয়ে আসার দুঃখ কাহিনী, তাইতে আমার গলায় গান এলো।

বল রাজা তোমার ঐ গানের ভাষার অর্থ কি? সারাটা মন আমার ঐ কথাগুলোর মানে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

রাজা রায় মৃদু হেসে বলল, এ এক প্রিয় সঙ্গবিধুরা নারীর

দীর্ঘশ্বাসের গান। সামনে তার বইছে দুস্তর এক নদী। নৌকোখানাও তার জীর্ণ; এ অবস্থায় নদীর ওপারে প্রিয়তমের সঙ্গে সে কেমন করেই বা মিলিত হবে। আজ এই নদীই হল তার বৈরী, অর্থাৎ শত্রু।

তুমি এমন করে মনের কথাকে রূপ দাও কি করে রাজা?

এ গানের কথা আমার তৈরী নয় অ্যানা। যুগে যুগে দুটি মনের মিলন-পথের বাধাগুলো কোন দরদী কবির লেখনীর মুখে ঝরে পড়েছে। আমি শুধু গাইলাম; তাঁর কথাগুলোকেই আরবার তোমার কাছে আবৃত্তি করে শোনালাম।

আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল এ কথাগুলোর!

রাজা রায় বলল, সেই মিলটুকুই তো আমাব গলায় গানের কথা জুগিয়ে দিলে অ্যানা।

এবার থেকে যেদিন আমি তোমার কাছে আসব অথবা তুমি যাবে আমার বাগানে সেদিন গান শোনাবে?

কথা দিলাম অ্যানা। আজ থেকে আমার গানের জগতে তুমি হবে সবচেয়ে সেরা অভিসারিকা।

ঠিক আজকের মত সেদিনও আমাকে কিন্তু গানের কথার মানে বলে দিতে হবে।

হেসে বলল রাজা রায়, নাই বা বললাম কথার মানে, আমাব সুরের চাবি তুলে দেব তোমার হাতে, তুমি নিজেই খুলে নিও কথার দুয়ার।

সেদিন রাজা রায়ের হাসিতে যোগ দিল অ্যানা হেপবার্ন।

ফেরার সময় যখন হল তখন রাজা রায় পৌঁছে দিতে চাইল অ্যানাকে।

অ্যানা হেসে বলল, একাই যদি কষ্ট করে আসতে পেরে থাকি তাহলে একাই যেতে পারব ফিরে। আবার একদিন এখানে এসে তোমার কাছে গর্ব করে বলতে পারব, আমার আসা যাওয়ার পথে আমি একাই নাবিক। কারো হাতে তুলে দিইনি আমার কষ্টের হাল।

রাজা রায় কৌতুক করে বলল, বড় অহঙ্কার তোমার অ্যানা।

প্রার্থনা কর তোমার ঈশ্বরের কাছে, আমি যেন এ গর্ব চিরদিনই করে যেতে পারি।

অ্যানা বৈঠার ঘায়ে বেয়ে চলল তার ছোট্ট নৌকো। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে গুণ গুণ করে গান ধরল রাজা রায়। যেন খরস্রোতা নদীর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছে,

নদীয়া ধীরে বহনা
মেরা সৈঁয়া উৎরঙ্গে পার রে—।

একি হল অ্যানা হেপবার্নের, বিছানায় তার কেটে গেল বিনিদ্র রাত্রি। যখন ভোরের হাওয়া বয়ে এলো দূরের পাহাড় থেকে; যখন শির শির করে কেঁপে উঠল নদীর জল, শন শন করে ঘুমের মন্ত্র পড়ল বন ঝাউয়ের গাছ তখন অ্যানার রাত-জাগা দুটো চোখে রাজ্যের ঘুম নামল।

আবার যখন ঘুম ভাঙল তার তখন বিছানার ওপর বসে থাকতে দেখল সে মৈত্রেয়ীকে।

বোধহয় সে এই ক্ষণিক ঘুমের ভেতর একটা কোন মধুর স্বপ্ন দেখছিল; আর সেই স্বপ্নের আনন্দটুকু অশ্রুর চিহ্ন হয়ে ফুটে উঠেছিল তার চোখে, মৈত্রেয়ী তাই নিয়ে তাকে প্রশ্ন করে বসল, মনে হচ্ছে শরীরটা ভাল নেই তোমার? এত বেলায় তুমি তো কখনো ওঠ না দিদি?

একটা মিষ্টি হাসি মুখে ছড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসতে বসতে বলল অ্যানা, খু-উ-ব ভাল আছি মেরী।

তারপর চোখ মুছতে গিয়ে হাতে লাগল সদ্য ঝরে-পড়া দুটি শিশির কণা। কেমন যেন লজ্জা পেল সে।

উঠে দাঁড়িয়ে মৈত্রেয়ী বলল, এই জন্যেই তোমার শরীরের কথা ভুলেছিলাম দিদি।

অ্যানা মৈত্রেয়ীকে আর যেতে দিল না। হাতখানা টেনে ধরে বিছানার ওপরেই বসাল তাকে। তারপর কপট ক্রোধে বলল, ভারী অন্যায় তোমার মেরী, চুরি করে কোন কিছু দেখে নিলেও শাস্তি পেতে হয়, জানো ?

হেসে বলল মৈত্রেয়ী, শাস্তি দাও, তবু শান্তি পাব। তোমার কাছে যে শুধু ভালবাসাই পেয়ে গেলাম দিদি। ভয় হয়, তোমার এত করুণার যোগ্য কিনা আমি !

পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে কিনা তুমি তাই এমন সুন্দর করে কথা বলতে শিখেছ !

আবার হাসল মৈত্রেয়ী, বাবার কাছে পড়ার সুযোগ আমার হয়নি কোনদিনও। আজকাল দেখছি বাবার ছাত্রী হয়ে তুমিও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলতে শিখেছ। সত্যি বলছি দিদি, অনেক সময় তুমি যখন গভীর ভাবে কোন কথা আলোচনা কর, তখন মনে হয় তুমি শুধু আমাদের এ দেশের মেয়েই নও, প্রাচীন ভারতের বিদুষী মেয়েরা বুঝি তোমার ভেতরে নতুন করে দেখা দিয়েছে !

হেসে বলল অ্যানা, বলে যাও মেরী, সকাল বেলা প্রশংসাগুলো শুনতে মন্দ লাগছে না।

আমার ভারী বয়েই গেছে প্রশংসা করতে। তোমার সম্বন্ধে এক মুখ নিন্দে ছড়াতে পারলেই আমি বাঁচি।

সকালের পরিবেশটাকে লঘু করে দিয়ে দুজনে উচ্চরোলে হেসে উঠল। পাশের কার্নিশে বসে থাকা দুটো পায়রা সবেগে পাখার আওয়াজ তুলে উড়ে গেল আকাশে।

ওদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল অ্যানা, জীবনটা মুক্ত আর ধ্বনিময়, তাই না মেরী ?

অ্যানার কথা বলার ধরন দেখে মৈত্রেয়ী অবাক হয়ে যায়। বলে, তুমি যখন এমনি করে কথা বলে যাও তখন আমার কি যে ভাল লাগে ! আমি অনেক সময় চট্ করে তোমার সুন্দর শুদ্ধ কথাগুলোর মানে বুঝে উঠতে পারি না।

এবার লঘু হল অ্যানা, আচ্ছা মেরী সত্যি করে বলবে একটা কথা ?

বল।

আমি যখন তোমাদের ভাষায় কথা বলি তখন উচ্চারণে ভুল থেকে যায় না ?

আমার কানে একটুও ভুল ধরা পড়ে না।

এ তুমি বেশী করে বললে মেরী। সেদিন পণ্ডিতমশায় সংস্কৃত পড়াতে গিয়ে দু'তুটো উচ্চারণের ভুল শুদ্ধ করে দিয়েছেন।

সংস্কৃতের কথা বলতে পারব না আমি, তবে যেভাবে তুমি বাংলায় কথা বল তাতে তোমাকে শাড়ি পরিয়ে দিলে তুমি অ্যানা নয়, মৈত্রেয়ী হয়ে যাবে।

আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে, অতি প্রশংসা ভাল নয়, তাতে নাকি মাথা বিগড়ে যায়।

একটু চুপ করে থেকে আবাব বলল অ্যানা, ছোটবেলা থেকে রয়েছি এই দেশে। এই বাংলা দেশকে নিজের দেশ বলে ভাবতে শিখেছি। এর ভাষা যে আমার ভাষা হবে এ তো স্বাভাবিক মেরী। আমি মনে প্রাণে, ভাষায় ভাবে এ দেশেরই মেয়ে, তাই না ?

মৈত্রেয়ী সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

আজ অ্যানাকে যেন কথায় পেয়ে বসেছে ! সে বলে চলল, আমি যে দেশে জন্মেছি, সে দেশকে জন্মভূমি বলে মনে করলেও মাতৃভূমি বলে মনে করতে পারি না মেরী। মায়ের একটি কাজ জন্ম দেওয়া, কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ সন্তানটিকে সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিদেশে আমি শুধু জন্মই নিয়েছি, কিন্তু আমাকে এত বছর ধরে লালন পালন করেছে এ দেশের মাটি, জল, আলো, হাওয়া আর মানুষের দল। আমি এদের থেকে পৃথক হতে চাই না মেরী। আমি রক্তের সম্বন্ধে যতটুকু বিশ্বাসী তার চেয়ে অনেক বিশ্বাসী প্রাণের সম্বন্ধে। তোমরা কোনদিন যদি আমাকে সরিয়ে দাও মন থেকে, আমি কিন্তু তেমনি করে পারব না তোমাদের দূরে ফেলে দিতে।

কথাগুলো একটানা বলে চলেছিল অ্যানা। আজ কি এক অনুভূতিতে যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

একটু থেমে আবার বলল, তুমি জান না মেরী, বাবা যখন দেশে চলে যাবার পরিকল্পনা নিলেন, তখন ক'টি রাত আমার কি চিন্তায় না কেটেছে! আমার একা থাকতে কোন ভয়ই ছিল না, শুধু আমার চারদিকের নেকড়েগুলো থেকে আমি কি ভাবে নিজেকে রক্ষা করব, সেই চিন্তাই পেয়ে বসেছিল আমাকে।

মৈত্রেয়ী বলল, নেকড়ে কাদের বলছ দিদি?

হাসল অ্যানা, বলল, যারা তোমাকে হরণ করতে চাইছে, সাধারণ মানুষদেব সবটুকু রক্ত শুষে নিচ্ছে, আর সবার ওপরে মুখে পরে রয়েছে বন্ধুত্বের এক একটা মুখোশ। নেকড়ে কি এদের চেয়েও হিংস্র, এদের চেয়েও ধূর্ত মেরী?

মৈত্রেয়ী সরল আন্তরিকতার সুরে বলে উঠল, তুমি খুব ভাল দিদি।

ভাল মন্দের কথা নয় মেরী। এদের দেখলে আমার সারা শরীর ঘৃণায় কুঁকড়ে যায়। মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবি কখন জানো, যখন ওদেরই সঙ্গে আমাকে নানান পরামর্শে যোগ দিতে হয়। টিকে থাকতে হলে ওদের সঙ্গে অনেক সময় পা ফেলে চলতে হয়, এইখানেই নিজের ওপর আমার অভিমান মেরী। ওদের সঙ্গ থেকে সরে আসার চেষ্টা করলেও পারি কই। এত দুঃখ সই শুধু এ দেশকে ভালবাসি বলে।

রামকান্ত ভট্টাচার্য মশায়ের আসার খবর এলো ওপরে। মৈত্রেয়ী 'সরে চলে গেল গৃহান্তরে। অ্যানা অপ্রস্তুত হল। সে ভুলেই গিয়েছিল পণ্ডিতমশায়ের আগমনের আজ একটি নির্দিষ্ট দিন।

সামান্য সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে সে নীচে নেমে এলো তার পড়ার ঘরে।

গুরুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল অ্যানা। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন ভট্টাচার্য মশায়।

গুরু শিষ্যার এই সৌজন্যটুকু অ্যানাই প্রবর্তন করেছিল প্রথম

সাক্ষাতের দিনটি থেকে। মনে মনে খুশী হয়ে প্রাণ খুলে ছাত্রীকে আশীর্বাদ করেছিলেন গুরু।

আজ অ্যানার মাথায় হাত রেখে বললেন অন্ধ রামকান্ত, বিলম্ব কেন মা? শরীর মন প্রফুল্ল আছে তো?

হাঁ, পণ্ডিতমশায়। কাল শুতে একটু রাত হয়েছিল, তাই আজ পড়ার ঘরে আসতে দেরি হয়ে গেল।

আমি তোমার দেরির জন্য কিছু বলছি না মা। অধ্যয়নের প্রস্তুতিই হল চিত্তের প্রসন্নতা। মন প্রসন্ন হলে সে গ্রহণের জন্যে উন্মুখ হয়। তখন বর্ষণ মাত্রই সুফল সম্ভব হয়।

পণ্ডিতমশায়, আজ আমাকে একটা বিষয় একটু বুঝিয়ে দেবেন?

বল মা।

'অভিসার' কথাটির অর্থ কি?

অভিসারের সাধারণ অর্থটুকুই কি তুমি জানতে চাইছ মা?

হাঁ, পণ্ডিতমশায়, অভিসার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণাই আমি পেতে চাই।

বলতে লাগলেন পণ্ডিত রামকান্ত, নির্দিষ্ট সংকেত স্থানে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় নায়ক অথবা নায়িকার যাত্রাই হল অভিসার। মহাজন পদকারেরা রাধা এবং কৃষ্ণের অভিসার লীলার বহু পদই রচনা করেছেন। সে সব পদ অতিশয় উৎকৃষ্ট।

বৃন্দাবনের মানস গঙ্গার পারে রয়েছেন হরি। মনোরম কুঞ্জে তিনি মানস প্রিয়া রাধার জন্যে কাতরভাবে প্রতীক্ষা করছেন। বাইরে একটি পাতা পড়ছে, অমনি তিনি সচকিত হয়ে ভাবছেন, ঐ বুঝি শ্রীমতী এলেন কুঞ্জে। জয়দেব গোস্বামী প্রতীক্ষার একটি সুন্দর চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন।

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানং
রচয়তি শয়নম্ সচকিত নয়নম্
পশ্যতি তব পন্থানম্

দয়িতার জন্য এই আকুলতা একদিকে, অন্য দিকে শত বাধা দূরে সরিয়ে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন-যাত্রায় প্রস্তুত হচ্ছেন শ্রীমতী রাধা। ঘরে রয়েছেন গুরুজন। দারুণ ননদিনী। পথে রয়েছে প্রকৃতির বাধা। আকাশ ছেয়ে নেমে এসেছে মেঘ। অন্ধকার ঘনঘোর। পিচ্ছল পথ। বিদ্যুতের চমক। বজ্রপতন শব্দ। এ সব বাধা দূরে সরিয়ে চলেছেন শ্রীমতী রাধা শ্যাম-অভিসারে।

সখিরা তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছেন। পরিয়েছেন বন কুসুমের মালা। অঙ্গে তুলে দিয়েছেন নীল বসন। শ্রীমতী যাত্রার আগে চরণে পরে নিতে চাইলেন নূপুব। কলহংসের ধ্বনি তুলে যখন তিনি চলবেন তখন দূর থেকে সে ধ্বনি পৌছবে দয়িতের শ্রবণে। তিনি জানতে পারবেন তাঁর দায়িতার আগমন বার্তা।

কিন্তু সখিরা বাদ সেধে বললেন, 'মুখরমধীরম্ ত্যজ মঞ্জীরম্'। তোমার মুখর অধীর ঐ নূপুবটি ত্যাগ কর সখি। অভিসার করতে হয় নীরবে। তোমার শব্দিত নূপুর যে গুরুজনের নিদ্রাভঙ্গ করবে। তাছাড়া দূর থেকে তোমার ঐ নূপুরের ধ্বনি শুনতে পেলে সাবধান হয়ে যাবেন চতুর কৃষ্ণ। তিনি যে তোমার প্রতীক্ষায় পরম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন তার কোন চিহ্নই আর তুমি দেখতে পাবে না তাঁর চোখে মুখে। তাই সখিরা বললেন, যদি যাবে অভিসারে তাহলে ত্যাগ কর তোমার মঞ্জীর।

থামলেন রামকান্ত ভট্টাচার্য। তারপর বললেন, অভিসারের একদিকে জ্বলবে প্রতীক্ষার একটি প্রদীপ, অন্যদিকে উদ্‌বেলিত হবে আকাঙ্ক্ষা। মাঝে বিঘ্ন আর দুঃখের বিস্তীর্ণ পথ। যত বাধা ততই বাধা জয়ের আনন্দ। এই হল অভিসারের মূল কথা।

আবার কিছু সময় থামলেন। তারপর বললেন, মনের প্রস্তুতি চাই মা। শুধু বাইরের বিপদ বরণই বড় কথা নয়, মনের লজ্জা, শঙ্কা, সংকোচ মোচন করা চাই।

নানাভাবে সেদিন পণ্ডিত রামকান্ত বোঝাতে লাগলেন অ্যানাকে অভিসারের রূপ। অ্যানা মুগ্ধ মনযোগে শুনল পণ্ডিতমশায়ের প্রতিটি

কথা। তার মনে গত সন্ধ্যা থেকে যে কথাটি ঘুরে ঘুরে ফিরছিল তার একটা পরিষ্কার ছবি সে চোখের ওপর ফুটে উঠতে দেখল।

'আমার গানের জগতে তুমি হবে সেরা অভিসারিকা', রাজা রায়ের কথাটা অ্যানা মনে মনে আর একবার উচ্চারণ করল।

অন্য একটি ছত্রও ধ্বনির ঝঙ্কারে, ভাবের মাধুর্যে অ্যানার মনে বার বার ফিরে ফিরে বাজতে লাগল, 'মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরম্'। অভিসারে যেতে হয় নীরবে। শুধু চারদিকের মানুষকেই গোপন করে যাওয়া নয়, যার কাছে যাওয়া তার কাছ থেকেও গোপন রাখতে হয় পথযাত্রার কথা।

আবার একটি সপ্তাহ ফিরে এল অ্যানার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে। এবার অ্যানা যাত্রা করল নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু আগে। ঘাটের অদূরে একটি গোপন জায়গায় সে বেঁধে রাখল তার ছোট্ট তরী। তারপর সন্ধ্যার ছায়া যেখানে রাজা রায়ের বাগানের দীর্ঘ গাছের ছায়াগুলোকে ঘনতর করে তুলছিল, তারই ভেতর দিয়ে সে এগোতে লাগল। না, তার অনুমানই ঠিক। এখনও রাজা রায় হিরণ্যগড় থেকে এসে পৌঁছয়নি তার জলসাঘরে।

অ্যানা দাঁড়িয়ে রইল একটি গাছের তলায়। তার পায়ের নীচে নুড়ি পাথরের জমি। পাশে এক ফালি নদীর ছবি। এক ঝাঁক জোনাকি আলোর ফুলকি ছড়িয়ে পাশ দিয়ে দ্রুত নাচের ভঙ্গীতে চলে গেল। ঝিঁঝিগুলো করুণ সুরে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। কোন একটি গাছের ওপর থেকে পাখির পাখার ঝাপট শোনা যাচ্ছে। তারপর এক সময় তাও স্থির হয়ে গেল। হাওয়া একটা বয়ে এলো নদীর ওপার থেকে। ঝিমিয়ে থাকা পাতাগুলো যেন সহসা সমস্বরে কথা বলতে শুরু করে দিল। নানা ধরনের ফুলের একটা মিশ্রিত গন্ধ ভেসে আসতেই অ্যানা বুক ভরে শ্বাস টানতে লাগল।

অ্যানা কতক্ষণ সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল তার কোন হিসেবই ছিল না তার। শুধু মনে হচ্ছিল সে যেন প্রস্তরীভূত হয়ে যুগ যুগ ধরে কারো জন্যে প্রতীক্ষা করে চলেছে।

রাতের অন্ধকারের গোপন আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিয়ে চাঁদ উঠল। অ্যানা সরে এলো বনের আরও নিবিড়ে।

আসছে। রাজা রায় গলায় পটদীপের ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে অ্যানাকে পার হয়ে সে চলে গেল বাঁধানো ঘাটের দিকে। সুরে ভরা কথাগুলো সকাল বেলার ভোমরার মত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

গাছের পাতা কাঁপছে। নদীর জল ছল ছল শব্দে বয়ে যাচ্ছে। রাজা রায় তাকিয়ে রইল ওপারের নীলকুঠির দিকে। তারপর কতক্ষণ ঐ শান বাঁধান ঘাটের পাটে পায়চারী করতে লাগল।

অ্যানা দেখছিল রাজা রায়কে। কোথা থেকে একটা কৌতুক এসে তাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু সে কৌতুক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি অ্যানার মনে। কখন তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এক হয়ে গেছে। সে দেখছে একটি প্রতীক্ষা-কাতর শিল্পীকে। আবার রাজা রায়ের কণ্ঠে বেজে উঠল গান। প্রথমে গুণ গুণ ধ্বনি, তারপর সমস্ত পরিবেশকে বিহ্বল করে ছড়িয়ে পড়ল সুর। কার যেন আসার কথা ছিল সে এল না। এমনি করে কেটে গেল কত যুগ। মন যে তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

পিয়া নাহি আয়ে
বহত দিনন বিতি
যবসে গয়ে মোরি
শুধাহু ন লীনী
চৈন নাহি জিয়ারা মোরা।

পায়ে পায়ে অ্যানা চলে গেল জলসাঘরের ঝিলের কাছে, যেখানে বাঁধা ছিল রাজা রায়ের নৌকো। সে উঠে বসল নৌকোর ওপর। প্রতীক্ষা করে রইল আর একটি মানুষের আগমনের। বহু পরে নৌকোর কাছে এসে দাঁড়াল রাজা রায়। এমন স্খলিত পদক্ষেপ এর আগে কখনো দেখেনি অ্যানা। মানুষটা যেন সহসা থেমে গেছে। তার নিজের ইচ্ছাতে যেন চালিত হচ্ছেনা।

না, এতখানি কৌতুক অ্যানার শোভন হয়নি। অ্যানা এবার মুখে হাসি টেনে বলল, অতিথির এতদূর অমর্যাদা আমি আশা করিনি রাজা!

চমকে সামনে তাকিয়ে রাজা রায় যেন নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারল না। তুমি, অ্যানা!

হাসির তরঙ্গ ঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে অ্যানা বলল, তুমি কি আমাকে চিনতেও পারছ না নাকি! অতিথির এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে!

কথা বলতে বলতে অ্যানা নৌকো থেকে উঠতে যাচ্ছিল। রাজা রায় হাত জোড় করে সহাস্যে বলল, আজ তুমিই তাহলে আমাকে আশ্রয় দাও অ্যানা তোমার নৌকোয়।

অ্যানা ডাঙায় উঠে বলল, বেশ মজা হল যা হোক! এখন স্থির করতে হবে, আমি তোমার অতিথি, না তুমি আমার।

অমনি রাজা রায় বলল, দু'জনে দু'জনের অতিথি হলে ক্ষতি কি। রাত এমন কিছু বেশী হয়নি। এখন এসো আমার জলসাঘরে তারপর আমাকে সুযোগ দিও তোমায় নীলকুঠিতে পৌঁছে দিয়ে আসার।

তারচেয়ে একটা কাজ করা যাক না রাজা। আজ আমরা কেউ কারো অতিথি নয়। চল উজান বেয়ে ঐ পক্ষীদ্বীপে। সেখানে আমরা আকাশের রূপোলী চাঁদ আর নদীর সোনালী চরের অতিথি হতে পারব।

সুবর্ণরেখার মাঝে একটি জায়গায় ডাঙা জেগে উঠেছিল। তাকে ঘিরে নদী দুটি স্রোতে বিভক্ত হয়ে আবার মিলিত প্রবাহে বয়ে গিয়েছিল। লোকালয় থেকে স্থানটি কিছু দূরে। কিন্তু তা বলে ওখানে কোলাহল কম ছিল না। হাজার হাজার পাখি ঐ চরের ওপর ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি মেলা বসাত। তাই লোকে ঐ চরটুকুর নামকরণ করেছিল, পক্ষী দ্বীপ। রাতে সেখানে বিরাজ করত নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। কয়েকটি বনঝাউ দোলাত ঝিরি ঝিরি পাতার ঝালর। আর এক রকমের বেগুনী ফুল ফুটত সূচিমুখ পাতাযুক্ত গাছের ফাঁকে ফাঁকে।

রাজা রায় অ্যানার অভিনব পরিকল্পনাকে সোৎসাহে স্বাগত জানিয়ে বলল, তোমার প্রস্তাবে রাজি আছি অ্যানা। চল আজ আমরা প্রবাদের পরীরাজ্যের অধিবাসীর মত সেই দ্বীপে ঘুরে বেড়াই।

দুজনে নৌকো করে চলল পক্ষী দ্বীপের অভিমুখে।

কথা বলল রাজা রায়, আচ্ছা অ্যানা আজ তোমার একি লীলা! আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে তুমি কেমন করেই বা এলে হিরণ্যগড়ের ঘাটে?

তুমি না বলেছিলে সেদিন, তোমার গানের জগতে আমি অভিসারিকা। তাই অভিসারের নিয়ম লঙ্ঘন না করেই তোমার কাছে এসেছি।

রাজা রায়ের হাতের হাল থেমে গেল। সকৌতুকে আবার প্রশ্ন করল, কি সে নিয়ম অ্যানা?

মনে মনে এবার কথাগুলো গুছিয়ে নিল অ্যানা। বলল, গোস্বামী জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থে রাধার অভিসার লীলার বর্ণনা আছে। সেখানে কবি রাধাকে অভিসার যাত্রার কালে পায়ে নূপুর পরতে বারণ করে বলছেন, 'মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরম্'। অভিসার যাত্রা হবে নিঃশব্দে, তবেই ত অভিসার সুন্দর আর সার্থক হয়ে উঠবে।

থামল অ্যানা।

রাজা রায় বলল, তোমার কথা শুনে সত্যিই আমার অবাক হবার পালা অ্যানা! তুমি কোথা থেকে জানলে কবি জয়দেব আর তাঁর কাব্যের কথা? এতো তোমার জানার কথা নয় অ্যানা!

এবার অ্যানার গলার স্বর গম্ভীর হল, শুধু তোমাদেরই কি সংস্কৃত পাঠে অধিকার আছে রাজা? আকাশ দেখার জন্যে যেমন জাতিধর্মের অনুশাসন মানার প্রয়োজন হয় না, তেমনি একটি শ্রেষ্ঠ ভাষার সাহিত্য পাঠ করতে হলে শুধু হিন্দু হয়ে জন্মাবারও কোন দরকার হয় না। আমি এই অপূর্ব সাহিত্যের ভেতর সেই আকাশকেই দেখছি।

রাজা রায় বলল, অকারণ তুমি আমার ওপর ভুল ধারণা করে বসলে

অ্যানা। সংস্কৃত পাঠে তোমার অধিকার আছে কিনা সে প্রশ্ন আমি তুলছি না এখানে। তুমি সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশের মাঝে থেকেও আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাষার সম্পদ কি করে পেলে তাই আমার প্রশ্ন।

এবার সহজ হয়ে এল অ্যানা। বলল, ভুল বোঝার জন্যে ক্ষমা কর রাজা। আমি এক পণ্ডিতমশায়ের কাছে সংস্কৃতের পাঠ নিয়ে থাকি। তিনি অন্ধ কিন্তু আশ্চর্য ভেতরের দৃষ্টি আছে তাঁর। মেঘদূত পড়াতে গিয়ে তিনি বর্ষার ফুল দেখতে পান চোখের সামনে। অভিভূত হয়ে বসে থাকেন।

তুমি কি পণ্ডিত রামকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা বলছ অ্যানা!

রাজা বায়ের গলায় কেমন যেন বিহ্বলতা।

অ্যানা কথাব পিঠে কথা বলেই চলেছিল, সে পরিস্থিতির গুরুত্ব ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেনি এতক্ষণ। তবু রাজা রায়ের জিজ্ঞাসাব উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ রাজা আমি পণ্ডিত রামকান্ত ভট্টাচার্য মশায়ের কাছেই সংস্কৃত শিখছি। তারপর একটু থেমে রাজা রায়কে সে প্রশ্ন করে বসল, চেন নাকি পণ্ডিত মশায়কে?

এবার যেন প্রবল স্রোতের টান থেকে নৌকো বাঁচানোর চেষ্টায় লেগে গেল রাজা রায়। নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে নিপুণ নাবিকের মত হাল ঘোরাতে লাগল।

অ্যানা হাসল মনে মনে। রাজা পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে।

কিছুক্ষণ কারো ·মুখে কোন কথা নেই। আনার মনে আর একটি স্রোত প্রবল হয়ে উঠল। সে আজ রাজা রায়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে চায় মৈত্রেয়ীর ওপর এখনও তার আকর্ষণ আছে কিনা। নারী হৃদয়ের এক অদম্য কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল।

আবার একসময় স্থির হয়ে বসল রাজা। অ্যানা তার প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপন করে বলল, কই আমার কথার উত্তর দিলে না তো?

আমাকে ক্ষমা কর অ্যানা, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে যত সহজ ঠিক ততটাই কঠিন।

অ্যানা বলল, আমি কি তোমাকে প্রশ্ন করে কোনভাবে আঘাত করলাম রাজা ?

না, অ্যানা, আহত আমি হয়েছি ঠিক, কিন্তু সে আঘাত তোমার দেওয়া নয়, বিধাতার।

অ্যানা বলল, তাহলে এসো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ প্রসঙ্গের আমরা ইতি টানি !

ওরা ইতিমধ্যে পক্ষীদ্বীপের কাছে এসে পৌঁছেছে। স্থানটি মনোরম সন্দেহ নেই। জ্যোৎস্না যেন তার সাদা আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে বালুচরে। বনঝাউএর গাছের ছায়াগুলো ঘনকালো আর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আনন্দে অ্যানা করতালি দিয়ে উঠল। রাজা রায়ের কিন্তু বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না।

বুদ্ধিমতী অ্যানা সবই লক্ষ্য করছিল। সে দেখল রাজা রায় যেন এই মুহূর্তে হয়ে গেছে এক সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ। কি যেন এক চিন্তার গভীরে সে ডুব দিয়েছে।

দ্বীপে এসে নৌকো লাগল। রাজা রায় একটা বনঝাউয়ের গাছের সঙ্গে বাঁধল নৌকোখানা। তারপর অ্যানার সঙ্গে চরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে বলল, এখানে আমরা বসতে পারি, কি বল অ্যানা ? জায়গাটা হয়তো তোমার পছন্দ হতে পারে।

তোমার হবে না ?

একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল রাজা রায়ের মুখে। চাঁদের আলোয় তা অ্যানার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না।

তুমি খুশী হলে আমিও হব অ্যানা।

অন্যমনস্ক হয়ে গেছে রাজা রায়।

অ্যানা পাশের একটা ক্ষীণ প্রবাহের দিকে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, দেখ দেখ রাজা, জলের স্বচ্ছ ধারাটি কেমন দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে পড়েছে।

বলতে বলতে অ্যানা কিশোরীর চাপল্য নিয়ে ঐ জলধারার কাছে

গিয়ে হাতের পাঁচটি আঙুল ডুবিয়ে স্রোতের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল।

ছায়া পড়ল অ্যানার সামনে। সে বুঝল রাজা রায় তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অ্যানা মুখ না ফিরিয়েই বলল, শিল্পীর গলা থেকে আজ নিশ্চয়ই কেউ গান চুরি করে নিয়েছে। না হলে এমন নীরব কেন?

পাশে এসে বসল রাজা রায়। আচ্ছা অ্যানা, দুঃখকে কি কোনদিন ভোলা যায়?

দুঃখকে ভুলতে নেই রাজা। দুঃখ ভুললে মনে সঞ্চয় করে রাখার মত রইল কি মানুষের।

রাজা রায়ের দিকে ফিরে বসল অ্যানা।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। তারপর রাজা বলল, আগুনকে শুকনো পাতা দিয়ে যতই ঢেকে রাখার চেষ্টা হোক না কেন, সে আগুন আরও জোরে জ্বলে উঠবে, দুঃখ ঠিক তেমনি নয় কি অ্যানা! ভুলে থাকবার জন্যে যত রকম করে মোছা হোক সে আরও বেশী করে মনের ওপর ফুটে উঠবে।

অ্যানা বলল, তাই তো বলছিলাম রাজা, দুঃখকে ভুলতে নেই। কারণ দুঃখ ভোলা যায় না। দুঃখকে সহ্য করার মন্ত্র শিখতে হয়। চল রাজা আজ ফেরা যাক্।

দুজনে উঠে দাঁড়াল এবার। এখন আর কারো মুখে কোন কথা নেই। ওরা এগিয়ে চলল নৌকোর দিকে।

ফিরে চলেছে নৌকো। রাজা রায় একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, তোমাকে গানের অর্থ বুঝিয়ে দেবার কথা ছিল, কিন্তু দেখ দেখি, সে কথা কি করে যেন আজ ভুলে গেলাম।

অ্যানা মুখ নীচু করে কি যেন ভাবছিল। মুখ তুলে বলল, সব কথার মানে বলে দেবার দরকার কি আছে, রাজা। কোন কোন সময় মন আপনিই শুনতে পায়, নিজেই সব অর্থ বুঝে নিতে পারে।

কাঁদছে অ্যানা, অঝোরে কাঁদছে। বিচারের বাঁধ দিয়ে সে কিছুতেই আটকে রাখতে পারছে না কান্নার ঢেউ।

মনে পড়ছে তার প্রথম দিনের কথা। একটি অশ্বারোহী পুরুষকে সে প্রায় বন্দী করেই এনেছিল তার নীলকুঠিতে! সেদিন সেই বন্দীকে সে মনের যতটুকু অনুরাগ ঢেলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তার পেছনে প্রচ্ছন্ন ছিল একটা উদ্দেশ্য। ভালবাসার জাল পেতে সে ধরতে চেয়েছিল একটি সুন্দর হরিণ। সে তাকে নিজের করে রেখে দেবে বলে ধরতে চায়নি। যার হরিণ তাকেই সে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু একি হল তার, নিজেই কখন যে জড়িয়ে পড়ল জালে। এখন কে কার কাছে ধরা পড়েছে, সে কথা কে বলে দেবে!

মাথা নেড়ে নেড়ে আপন মনে বলতে লাগল অ্যানা, আমি চাইনি, চাইনি রাজা আমার মাঝে তোমাকে জড়াতে। কিন্তু কেমন করে বল আমি জড়িয়ে পড়লাম আমার নিজের খেলার জালে! কি অসহায় আজ মনে হচ্ছে নিজেকে। দুটি হাত জোড় করে প্রার্থনা জানাচ্ছি। রাজা, তুমি খুলে দাও এ বাঁধন। তুমি ছাড়া আর কেউ আজ আমায় মুক্ত করতে পারবে না।

মনের সঙ্গে সারাটা রাত এমনিভাবে যুদ্ধ করেছিল অ্যানা, আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল তার শয্যা। হঠাৎ কখন ঘুম নামল তার চোখে। ভোরের শুকতারা দেখা দিল আকাশে। জানালা দিয়ে তার স্নিগ্ধ একটি আলোকরেখা এসে পড়ল অ্যানার মুখের ওপর। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল সে। শুকতারাটি তখনও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে আকাশে।

অ্যানা ঘরের দেয়ালে লগ্ন একটি ছবির কাছে উঠে এসে নতজানু হয়ে বসল। শিল্পীর হাতের তুলিতে ছবির আকাশেও জ্বলছিল উজ্জ্বল এক তারা। একটি কুটিরের অঙ্গনে মাতা মেরীর কোলে মুক্তিদাতা যীশু! ঐ আকাশের তারার মতই সুন্দর স্নিগ্ধ নবজাতক!

অ্যানা প্রার্থনা শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার মন শান্ত

হয়ে গেছে। একটা অপার আনন্দ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখন কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ তার চিত্তকে অধিকার করতে পারবে না। কোন দৈহিক প্রয়োজন তাকে পীড়া দিতে পারিবে না। সে এখন সবাইকে দেবে। নিজের যা কিছু আছে সব পারবে উজাড় করে ঢেলে দিতে।

ভোর হয়ে এসেছে। অ্যানা ছাদের ওপর উঠে এল। পায়চারি করতে করতে দেখতে পেল, নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ঝাঁক ঝাঁক পানকৌড়ি। আজ বড় সুন্দর লাগল ওদের যাত্রা।

ও কে চলেছে ঢালু প্রান্তরের দিকে! অ্যানা এসে দাঁড়াল ছাদের এক প্রান্তে।

মেরী না! ভোরবেলা কোথায় চলেছে ও। অ্যানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। প্রান্তর যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, ঠিক তারই সীমানায় কুঠির শেষ প্রান্তে একটি শিউলি গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল মেরী। ঝরে পড়া কিছু ফুল কুড়িয়ে আবার ফিরল নদীর দিকে। নদীর জলে নেমে পূবদিকে তাকিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করল। তারপর অঞ্জলিভরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল সেই ফুল।

উঠে আসছিল মৈত্রেয়ী। ছাদের প্রান্ত থেকে সরে গেল অ্যানা।

আবার তার কান্না পাচ্ছিল। রাতে ঘরে ফেরার পরের ঘটনাগুলি মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। কি নিষ্ঠুরের মতই না সে ব্যবহার করেছে মেরীর সঙ্গে।

ও যখন গোপন পথে রাজাকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলো কুঠিতে তখন ওপরে উঠতে গিয়ে দেখতে পেল পড়ার ঘরে তখনও জ্বলছে আলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে বসে আছে মৈত্রেয়ী।

কতক্ষণ ধরে তাকে দেখল অ্যানা। নিজের রূপের সঙ্গে কেন যেন সেই রাতে মৈত্রেয়ীকে মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল তার। তার মনে হল মৈত্রেয়ী সুন্দরতর। এই ভাবনা যেই তার মনের কোণে উদিত হল অমনি কোথা থেকে জেগে উঠল কাল বৈশাখীর একটুকরো মেঘ।

ঈশান কোণের একটুখানি মেঘ মুহূর্তে ঢেকে দিল সারা আকাশ। ঝড় উঠল। অ্যানার মনে হল মেরী তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ওকে ভেঙে ছিঁড়ে উড়িয়ে ফেলে দেবার প্রবল একটা ইচ্ছা হঠাৎ জেগে উঠল মনের মধ্যে।

এগিয়ে গেল অ্যানা। মৈত্রেয়ীর কাছে গিয়ে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কি হচ্ছে তোমার মেরী? দেখছি দিন দিন তুমি আমাকে পাগল করে তুলেছ। কি জন্যে এত রাত পর্যন্ত বসে আছ এখানে?

ভয় চকিত চোখে অ্যানার দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল মৈত্রেয়ী। কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি সেই কখন বেরিয়েছ, তোমার ঘরে গিয়ে দেখলাম, এখনও ফেরনি, তাই তোমার অপেক্ষায় বসেছিলাম দিদি।

আমার আসার অপেক্ষায় বসেছিলে?— ঝাঁঝিয়ে উঠল অ্যানা, কে বলেছে তোমাকে আমার পিছু নিতে? কবে থেকে এমন চরের কাজ শুরু করলে মেরী। ছিঃ ছিঃ, যে তোমাকে তুলে আনল পথের থেকে তাকেই তুমি নামাতে চাইছ পথের ধুলায়! কে তোমাকে রাতের আঁধারে আমার ঘরের ভেতর ঢুকে খোঁজ খবর নেবার অধিকার দিয়েছে?

কাল বৈশাখীর দুরন্ত ঝড় বয়ে গেল ঘরের ভেতর। আহত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভেঙে পড়ল মৈত্রেয়ী। মাটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল। সে প্রায় নিঃশব্দে মুখ নত করে চলে গেল তার শোবার ঘরের ভেতর। মৈত্রেয়ীর চলে যাবার পথের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল অ্যানার জ্বালাধরা চোখের আগুন।

এখন সব কথাই মনে পড়তে লাগল অ্যানার। কি নিষ্ঠুরের মতই না সে ব্যবহার করেছে মেরীর সঙ্গে। তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সে চালিয়েছে নির্মম শাসন। এত নীচে সে নেমে যেতে পারল কি করে! তার ভেতর অ্যানা হেপবার্নকে হত্যা করে কে এই অপরিচিতা জেগে উঠেছে!

অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগল অ্যানা। তার মনে হল, এই মুহূর্তে

ছুটে গিয়ে সে মেরীকে জড়িয়ে ধরে বুকে। তার চোখের ধারায় স্নান করিয়ে শান্ত করে দেয় মেরীর তপ্ত কাতর মন।

না, এখন সে গেল না মৈত্রেয়ীর কাছে। কিংবা ডাক দিয়েও আনল না নিজের কাছটিতে।

অনেকদিন ঘোরা হয়নি তার জমিদারিতে। তাছাড়া নীলকুঠির খাতাপত্রও ক'দিন ধরে সে দেখছিল না। এখন মনে হল, এ কাজগুলো তার আগেই করা উচিত ছিল। সকাল থেকে অ্যানা রইল বাহির মহলে। সেখানে আমলা গোমস্তা আর নায়েবমশায়কে নিয়ে জমিদারির নতুন কাজকর্ম সম্বন্ধে সে আলোচনা করতে লাগল। প্রজাদের কথা দিয়েছিল সে, নীলের পরিবর্তে তাদের সবটুকু জমিতে ধান চাষেরই সুযোগ করে দেবে।

দাঙ্গা হাঙ্গামা মিটে যাবার পর নায়েবমশায়কে সেই আদেশই সে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে দিয়েছিল, যদি স্বেচ্ছায় কেউ নীলের চাষ কবতে চায় তাহলে লাভের অর্ধেক ভাগ তাকে দেওয়া হবে।

প্রজারা তাদের নতুন মনিবের উদারতায় এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে তারা নিজেরা বসে ঠিক করেছিল, আদ্ধেক জমিতে তারা স্বেচ্ছায় নীল বুনবে।

এই নতুন ব্যবস্থার তদারকি করতে অনেক সময় কেটে গেল অ্যানার।

নায়েবমশায় বললেন, এতে হাল খাতার সময়ে আমাদের কিছু মন্দা পড়বে।

অ্যানা হেসে বলল, অনেক লাভ করেছেন এতদিন ধরে, এখন না হয় একটু লোকসানই ভোগ করলেন।

আমলা গোমস্তারা মাথা নীচু করে বসে আছে দেখে অ্যানা আবার বলল, আমি জানি, আমার জমিদারির কাজে যে সব কর্মচারী বহাল রয়েছেন তাঁদের উপরি আয়ের পথ বন্ধ। কিন্তু আপনারা যথার্থ বলুন দেখি, হেপবার্নদের নীলকুঠিতে যে মাহিনা দেওয়া হয়, অন্য কোথাও তার আদ্ধেক মাহিনা কেউ দেয় কর্মচারীদের ?

উপস্থিত কর্মচারীরা সকলেই অ্যানার কথার সমর্থন সূচক মাথা নাড়ল।

অ্যানা কাজকর্ম সেরে মধ্যাহ্ন পার করে ঘরে এসে ঢুকল। তারপর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে বিশ্রামের জন্যে একটা ইজিচেয়ারের আশ্রয় নিল। না, বিশ্রাম নেওয়া আর হল না তার। মনে হল, দেশে বাবাকে অনেক দিন চিঠিপত্র লেখা হয়ে ওঠেনি, আজ নিশ্চয়ই এ কাজ সে শেষ করবে।

বসে বসে অ্যানা চিঠি লিখল বাবাকে। কত সমাচারই যে সে পাতা ভরে দিল তার লেখা জোখা নেই। শেষে বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিল তার মায়ের মৃত্যুর স্মরণীয় তারিখটি।

চিঠি লিখতে লিখতে উঠে গেল সে বাগানের ভেতর। তার মায়ের শ্বেত-পাথরে গড়া কবর। কামিনী গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার বাবা এখানে এসে দাঁড়াতেন। কখনো বা তাকে বলতেন, এই ফুলের গাছটি বড় সুন্দর। থোকা থোকা সাদা ফুল, কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ! আর দেখ, এর ছোট ছোট পাতাগুলো কত সবুজ কত মসৃণ। তোমার মা এই গাছটি খুব ভালবাসতেন।

অ্যানা কামিনী গাছের থেকে একটি ছোট্ট পাতা তুলে নিল। ঐ পাতাটি সে চিঠির সঙ্গে ভরে দিল খামের ভেতর।

তার মন হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। বাবা কি এখনও কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ভাবেন তার মায়ের কথা!

অ্যানা আবার এসে গা এলিয়ে দিল ইজিচেয়ারে। শুয়ে শুয়ে সে ভেবে চলল তার অতীত জীবনের কথা। কত স্মৃতির বিচিত্র সব চিত্রপট ভেসে উঠছিল তার মনের ওপর! সে যেন এক নৌকোর মাঝি! স্রোতের টানে ভেসে চলেছে তার নৌকো। কত ঘূর্ণি, কত ঝড়ের মুখ থেকে সে পেরিয়ে চলেছে। কত নতুন নতুন ঘাটে ভিড়ছে তার তরী। সুখাবহ, দুঃখবহ কত লেনদেন, কত হাসি কত অশ্রুর খেলা।

সহসা এ কোথায় এসে ভিড়ল তার তরী ! এ ঘাটের খবর তার কাছে ছিল একেবারেই অজানা। তারপর কেমন ধারে ধীরে এই ঘাটেই নৌকোখানা বেঁধে সে উঠে এলো তীরে। কত গাছ, কত ফুল, কত পাখি পেরিয়ে সে এলো এক সরোবর-কূলে। একটি মনোরম মহল যেন সেই সরোবর থেকে স্নান করে উঠে আকাশে দাঁড়িয়ে আছে হেলান দিয়ে। একটি মানুষ নেমে আসছে সেই জলমহল থেকে। গলায় উঠছে গানের ঢেউ, সরোবরের ওপর তৈরি করছে জলবলয়।

তার কাছে এগিয়ে এসে অপরিচিত মানুষটি বলল, তোমার জন্যেই যে এতকাল আমি প্রতীক্ষা করেছিলাম। বল, কি সওদা নিয়ে এসেছ তোমার তরীতে ?

সে বলল, আমার তরী যে শূন্য, তোমাকে দেবার মত তো কিছুই নেই।

হাসল মানুষটি। বলল, সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু তো আমার সামনেই দাঁড়িয়ে।

আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল অ্যানার সারা দেহে। তারপর মনে হল, সে কি এতক্ষণ স্বপ্নের মাঝে ভেসে চলেছিল !

বেলা পড়ে এসেছে, অ্যানা উঠল চেয়ারখানা ছেড়ে। একটা মধুর ক্লান্তি তার সর্বাঙ্গ ঘিরে। সে তাকাল আকাশের দিকে। সূর্যের শেষ সোনা গায়ে মেখে পাশাপাশি নীড়ের উদ্দেশ্যে উড়ে চলেছিল দুটো পাখি। সে শুনতে পেল তাদের তৃপ্তির ডাক ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসের বুকে। মুহূর্তে তার মনটা হু হু করে উঠল। তার মনে হল, এখুনি সে যদি রাজা রায়কে একবার না দেখতে পায় তাহলে সমস্ত মন যেন তার অসহনীয় ব্যথার ভারে ভেঙে পড়বে।

সে ভুলে গেল তার সকালবেলার প্রতিজ্ঞার কথা। সে মনে মনে চীৎকার করে উঠল, রাজা, রাজা, আমার রাজা। তোমাকে ছেড়ে একটি মুহূর্ত আর আমি থাকতে পারব না। শুধু তুমি বসতে দিও আমাকে তোমার পাশটিতে। আমি নীরবে বসে অনন্ত কাল ধরে

দেখব তোমাকে। শুনব তোমার গান। আর শুনব আমার নাম, তোমার গলায় কি সুরে বেজে ওঠে।

এখুনি সে যাবে রাজা রায়ের জলসা ঘরে। আজ তার অভিসারে যাবার নির্দিষ্ট দিন নয় সে জানে। তবু চিরদিনই প্রিয় সমাগমের কাল অনির্দিষ্ট।

অ্যানা কাল বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ল হিরণ্যগড়ের বাঁধা ঘাট লক্ষ্য করে। মনে তার নানা জিজ্ঞাসা। হঠাৎ রাজা তাকে দেখে কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে। সে কি তার আকস্মিক উপস্থিতিতে বিস্মিত করে দিতে পারবে না রাজাকে! রাজা হয়ত তার দিকে এগিয়ে এসে বলবে, আমার জীবনে এমন আনন্দের লগ্ন আর কখনো আসেনি অ্যানা।

স্রোতের টানে অ্যানার নৌকো খুব তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছল হিরণ্যগড়ের ঘাটে। নৌকো বেঁধে রেখে অ্যানা ত্বরিত পায়ে উঠে এল বাঁধা ঘাটের ওপর।

কিন্তু একি হল অ্যানাব। জলসাঘরেব দিকে সে যেন আর এগোতেই পারছে না। কে যেন তার দুটি পায়ে শক্ত করে শেকল পরিয়ে দিয়েছে!

একি ভাবনা নেমে আসছে তার মনে! যদি রাজা তাকে দেখেও উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে! সে যদি ভাবে, তার জীবনে আমি অতিরিক্ত। গতরাতে অতীতের একটা গভীর ক্ষতের আবরণ সে সরিয়ে দিয়ে এসেছে। রাজা যদি তার সেই হারিয়ে-যাওয়া অতীতকে নিয়ে হাহাকার করে ওঠে তা হলে কি করে সে তখন দাঁড়িয়ে থাকবে রাজার কাছে।

দীর্ঘ গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। অ্যানারও সেই অবস্থা। পেছনে ফিরে আসা আর সামনে এগিয়ে যাওয়া, এখন দুইই তার কাছে সমান হয়ে গেছে।

তবু এগোতে হল। কিন্তু সে যেন পেছিয়ে আসার জন্যেই। জলসাঘরে আজ জ্বলছিল না কোন বাতি। রাতের অন্ধকারে আরও

গাঢ়তর অন্ধকার সৃষ্টি করে এক অচেনা অজানা রহস্যপুরীর মত দাঁড়িয়েছিল রাজা রায়ের জলসাঘর।

যত ধীরে এসেছিল অ্যানা, তত দ্রুতই ফিরে গেল সে তার নৌকোর কাছে। তারপর বেয়ে চলল নীলকুঠির দিকে।

এখন সে কি গভীর দুঃখে মথিত? আশাহত নায়িকার মর্ম যন্ত্রণায় সে কি বিক্ষত? না, বরং এই মুহূর্তে সে কেমন এক শান্তি বোধ করছে! যে দুশ্চিন্তার ভার নিয়ে সে মুখোমুখি হতে গিয়েছিল রাজা রায়ের, সেই অনিশ্চিত অবস্থার হাত থেকে আপাতত রক্ষা পেয়ে সে নিজেকে সুস্থ আর সুখী বোধ করছে।

নীলকুঠিতে পৌঁছল অ্যানা। দুঃখের চেয়ে সোয়াস্তির চিহ্নই এখন ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

ওপরে উঠে আসছিল অ্যানা। চোখ পড়ল তার লাইব্রেরী হলের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার সময়ে ঐ ঘরখানা সবারই চোখে পড়ে। একি, আজ আলো জ্বলছে না এ ঘরে!

মৈত্রেয়ী আসার পর থেকে রোজই এ ঘরে আলো জ্বলে। অ্যানা তাকে শুধু যে ইংরাজী বলতে শিখিয়েছে তাই নয়, অনেক ভাল ভাল ইংরাজী বই পড়তেও শিখিয়েছে। এই সময়ের ভেতর এ বিষয়ে আশ্চর্য উন্নতি করেছে মৈত্রেয়ী। সকাল থেকে রাত অবধি যখনই সময় পেত সে, পড়ার ঘরটিতে বসে বসে শুধু পড়াশুনাই করে যেত। বিশেষ করে যখন দিনের আলো নিভে আসত তখন সে কিছুতেই অন্য কোন ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইত না। রাতের অন্ধকার যেন তার বদ্ধ মনের সহস্র বন্ধ দরজা জানালার কপাট খুলে দিতে চাইত। তার সেই খোলা দরজা, জানালা দিয়ে ঢুকে আসত না-পাওয়ার যন্ত্রণা-কাতর কামনা বাসনাগুলো। মৈত্রেয়ী মুক্তি চাইত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলত, প্রভু মুক্তি দাও। আমাকে বঞ্চিত করেছ তাও সহেছি নীরবে, কিন্তু কামনার কান্না থেকে আমাকে বাঁচাও।

তাই রাতে প্রায়ই সে নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইত।

প্রথম প্রথম তাকে সঙ্গ দিত অ্যানা। কিন্তু কুঠির নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য ইদানিং অ্যানা তাকে সঙ্গ দিতে পারত না। মৈত্রেয়ী তাই সন্ধ্যার ঠিক পরেই নিজে এসে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করত। লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে মগ্ন হয়ে যেত পড়ায়। কত চরিত্র, কত দেশ, তার চোখের সামনে এগিয়ে আসত। কেটে যেত তার নিদারুণ নিঃসঙ্গতা। সে চলত তার পঠিত বইয়ের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে সমান তালে। তখন মৈত্রেয়ী তাদের আত্মীয়, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী।

অ্যানা চলার পথে থেমে গেল। দীর্ঘদিন ধরে সে দেখে আসছে, সন্ধ্যা নামলেই মেরী বসে বসে ঝাড়-লণ্ঠনের তলায় বই পড়ে। আজ সহসা চোখের ওপর থেকে সে ছবি মুছে যেতে অ্যানা কেমন যেন উদ্বিগ্ন বোধ করল। সে পায়ে পায়ে উঠে এলো তাব ঘরে। নিয়ম মত আলো জ্বলছিল সেখানে। কাঁপছিল মোমবাতির শিখা। সমস্ত ঘরে একটা থম থমে ভাব, অখণ্ড নীরবতা।

অ্যানা মোমবাতির স্বল্প আলোয় দেখতে পেল, গত দিনের ফুল-দানির ফুলগুলো আজও রয়েছে সেখানে। রোজকার নিয়ম মত কেউ নতুন ফুল এনে রাখেনি পুবোনো ফুলের জায়গায়।

দাসীর কাজ ছিল শুধু ঘরে ঘরে বাতি জ্বালা। আর প্রতি দিনের গৃহ সজ্জার সবটুকু কাজ মৈত্রেয়ী তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে।

অ্যানা দেখল বাতিটাও যেন অনিচ্ছায় আলো দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন প্রজ্বলিত দীপশিখা ঘরের যে ছবি দেখতে পায়, আজ যেন তার একান্ত অভাব লক্ষ্য করে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে! সবকিছু অ্যানার চোখে মনে হল অসমাপ্ত, অসুন্দর। অ্যানা বুঝল, যার হাতের ছোঁয়ায় প্রতিদিন সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে সে আজ এ ঘরে অনুপস্থিত।

নিজের দিকে তাকাল অ্যানা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। নিজেকে আজ তার এমন অপরিচিতা বলে মনে হচ্ছে কেন! সে কি

ওডেন হেপবার্নের কন্যা অ্যানা হেপবার্ন ? সে-ই কি প্রজাদের নীল চাষের বদলে খুশিমতো জমিতে ধান বুনতে বলেছিল ? আর সে-ই কি এক শীতের রাতে একটি অসহায় ভাগ্য বিড়ম্বিতা মেয়েকে এনে তুলেছিল এই বাংলোতে ; রেখেছিল তার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি ?

আবার দেখল নিজেকে। না, তার ভেতর অ্যানা হেপবার্ন মরে গেছে। সেখানে জেগে রয়েছে আর একটি মেয়ে। বড় সংকীর্ণ, বড় স্বার্থপর সে। কাউকে কখনো যে কিছুই দিতে জানে না, শুধু কেড়ে নিতে জানে।

নিজের ওপর ক্ষোভে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল অ্যানা। না, এমন করে সে কিছুতেই নিজেকে মরতে দেবে না। সে বাঁচবে, যেমন করে ওডেন সাহেবের মেয়ে অ্যানা হেপবার্ন এতকাল বেঁচেছিল।

মেরী, মেরী, মেরী। সারা কুঠি কাঁপিয়ে অ্যানা মৈত্রেয়ীকে ডাক দিয়ে ফিরতে লাগল। সে এক সময় উঠে এলো আরও ওপরে। গোলগম্বুজের মধ্যে পরিত্যক্ত একটি ছোট্ট ঘর। তারই ভেতর জ্বলছিল একটি মাটির প্রদীপ। প্রবেশের দরজা ঈষৎ ভেজান ছিল। অ্যানা এবার নিঃশব্দে উঠে এলো সেই ঘরের দরজার পাশে। মৈত্রেয়ী করজোড়ে প্রার্থনা করছিল। দুটি চোখ তার নিমীলিত।

কতক্ষণ তাকে দেখল অ্যানা। পবিত্র একটি মুখের ছবি। মৈত্রেয়ী কি যেন উচ্চারণ করছিল। সম্ভবতঃ ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করছিল তার প্রাণের আকূতি। করুণ একটা চাপা কান্নার মত শোনা যাচ্ছিল তার কথাগুলো। বোধকরি বিশ্বের সকল স্তবই কান্নার সুরে গীত হয়।

কতক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাল মৈত্রেয়ী। ইতিমধ্যে নিঃশব্দে দরজাটি খুলে সামনে দাঁড়াল অ্যানা।

উঠে দাঁড়াল মৈত্রেয়ী। যে চোখ দুটি তার এক মুহূর্ত আগে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় নিষ্কম্প ছিল, সেই চোখই এখন ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

অপরাধীর মত বিচারপতির মুখ থেকে দণ্ডের আদেশ শোনার জন্যে সে যেন তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উন্মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অ্যানাই কথা বলল, তুমি এত শাস্তিও দিতে পার মেরী!

মৈত্রেয়ীর চোখ ছল ছল করে উঠল।

অ্যানা আর কোন কথা না বলে দুটি হাত বাড়িয়ে নিবিড় বাঁধনে বেঁধে ফেলল মৈত্রেয়ীকে। অ্যানার চোখের জল তখন বন্যার মত নেমে এসেছে।

অস্ফুটে অ্যানার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কত দুঃখ আমি তোমাকে দিয়েছি মেরী! কাল রাত থেকে তোমার মুখের কথাগুলোও আমি কেড়ে নিয়েছি। এত নিষ্ঠুর আমি! এত স্বার্থপর আমি! বিশ্বাস কর লক্ষ্মীটি, তোমাকে যে আঘাত আমি দিয়েছি, তার বহুগুণ হয়ে তা আমার বুকে ফিরে এসে বেজেছে। আমাকে একটু শান্তি দাও মেরী। তুমি ভুলে যাও আমার তিরস্কার।

অ্যানার বুকে মুখ গুঁজে বালিকার মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মৈত্রেয়ী।

সেই কান্না জড়িত গলাতেই সে বলতে লাগল, তোমাকে ভুল বুঝলে আমার সম্বল কি আর রইল দিদি। তোমার স্নেহ হারালে আমি যে নিঃস্ব হয়ে যাব! আমি সুখ চাই না, শুধু তোমার একটুখানি ভালবাসার কাঙাল হয়ে থাকতে চাই।

হৃদয়ের বুঝি জাতি নেই, তাই কিছুক্ষণের পর দেখা গেল সমস্ত বিরোধের শেষে দুটি হৃদয় এক হয়ে মিলে গেছে। প্রবল ঝড়ের শেষে ধারাবর্ষণে কখন নিঃস্ব হয়ে গেছে ঘন কালো মেঘ! এখন সমস্ত আকাশ সদানন্দময়—স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নক্ষত্র-খচিত।

কথা হচ্ছিল।

আমি তোমার আবার বিয়ে দেব মৈত্রেয়ী।

হিন্দু মেয়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় না দিদি।

অ্যানা বলল, হিন্দু পুরুষদের তো দেখি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধা হয় না?

তা হলেও মেয়েদের বেলা ও নিয়ম খাটে না।

এ তোমার সংস্কারের কথা মেরী, সুস্থ বুদ্ধি বা বিচারের কথা নয়।

আমরা শিশুকাল থেকে এই ভাবেই ভাবতে শিখি। তাই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেও এর সমাধান আর খুঁজে পাই না।

অ্যানা এবার একটু গম্ভীর হয়ে বসে রইল। কি যেন ভাবল মনে মনে, তারপর বলল, আচ্ছা মেরী, যদি কোনদিন তোমার হারিয়ে যাওয়া মানুষটি তোমার কাছে এগিয়ে এসে বলে, তুমি এসো আমার কাছে। আমি তোমার সমস্ত মিথ্যা কলুষ মুছিয়ে দেব। তাহলে কি তুমি ফিরে যাবে না তার কাছে?

মৈত্রেয়ীর চোখে জল এলো। সে মাথা নেড়ে বলল, না দিদি, তাহলেও ওর কাছে যেতে পারব না।

এবার আশ্চর্য হবার পালা অ্যানার। সে বলল, আমাকে অবাক করলে মেরী। তুমি কি একটা জড় পদার্থ?

মৈত্রেয়ী কান্না-ভেজা গলায় বলল, আমার জন্যে ঐ মানুষটি সমাজের চোখে ছোট হয়ে থাকবে এ আমি সইতে পারব না।

অ্যানা বলল, আশ্চর্য তোমাদের মন, বিচিত্র তোমাদের ভালবাসার ধারণা।

মৈত্রেয়ী এবার সহজ হয়ে বলল, তুমি রাগ করলে দিদি?

রাগ নয় মেরী, দুঃখ। সমাজের একটা গোড়ামির জন্য সুস্থ বুদ্ধিকে মানুষ বলি দেবে?

এবার মৈত্রেয়ী পরিস্থিতিকে লঘু করে দিয়ে বলল, যা কল্পনার জিনিস তা নিয়ে এত মাথা ঘামিয়ে লাভ কি বল?

ও কথায় কান না দিয়ে অ্যানা বলল, তুমি না বলেছিলে মেরী আমাকে খুব ভালবাস?

হেসে বলল মৈত্রেয়ী, তোমার সন্দেহ হয়েছে বুঝি আমার কথায়? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, তোমার ওপর কিভাবে নির্ভর করি তা কেমন করে বোঝাব বল!

মৈত্রেয়ী পেছন থেকে দুটি হাত বেস্টন করে অ্যানার মুখখানা নিজের হাতের অঞ্জলিতে তুলে ধরল।

অ্যানা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি না এখুনি বললে, আমার ওপর তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর কর?

আমার সব ভার সব ভাবনাই তো তোমার দিদি।

তাহলে নিজের সম্বন্ধে কোনকিছু না ভেবে, আমার ভাবনার ওপরই ভরসা করে থেকো, কেমন?

হাসি-হাসি মুখে মৈত্রেয়ী মাথা নেড়ে জানাল, সে আজ থেকে তার সব ভাবনা ঐ সুবর্ণরেখার জলে ভাসিয়ে দিয়ে, শুধু তার দিদির দিকে বিশ্বাস-ভরা চোখে তাকিয়ে থাকবে।

বৌঠানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ছোটকুমারের।

আচ্ছা বৌঠান, দাদা তো ইংরেজদের নামে হাড়ে চটা, এ সময় যদি ঐ মেমসাহেবটিকে বিয়ে করে ঘরে তুলি, তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে বল তো?

মুখদর্শন বন্ধ।

তুমিও তাই করবে নাকি?

পতিগতপ্রাণার তাই করাই কি ঠিক নয় ভাই?

অবশ্যই, তবে এই আমার মাথায় হাত রেখে বলতো কতদিন আমার এই চাঁদমুখখানা না দেখে তুমি থাকতে পারবে।

একটি দিনও না,—হেসে উঠলেন বিলাসবতী।

বললেন, কিন্তু বউ নিজে না দেখে ঘরে তুলতে পারব না বাপু। হোক মেমসাহেব, রায়বাড়ির বউকে নিজেই পছন্দ করে আনব।

আচ্ছা বৌঠান, সমাজ যে আমাদের একঘরে করবে তাহলে!

তোমার দাদার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা সমাজের কারো নেই।

আচ্ছা বৌঠান, যদি ঐ রামকান্ত ভট্টাচার্যের মেয়ে ফিরে এসে বলে, আমাকে নাও, নিতে পারবে তাকে?

গম্ভীর হলেন বিলাসবতী।

তারপর বললেন, আমি হলে তাকে ছাড়তে পারতাম না ভাই ; কি দোষ সেই হতভাগিনী মেয়েটার বল তো ? ডাকাতের হাতে পড়ে আজ সে সমাজ হারিয়ে কোথায় যে ভেসে গেছে তার ঠিক নেই।

ছোট কুমার বাহাদুর কথাটাকে অন্যপথে নিয়ে গিয়ে বলল, তাহলে একটা দুশ্চিন্তা আমার গেল বৌঠান।

দেবরের দিকে তাকালেন রানী বিলাসবতী।

আর যাই হোক, মেমসাহেব যদি রাজী থাকেন তাহলে বৌঠান তাঁকে ঘরে তোলার ব্যাপাবে একটা ব্যবস্থা কবে দিতে পাবেন।

হ্যাঁ ভাই, গানই শুধু জানে, না কিছু কাজকর্ম্মও করতে পারে ?

বন্দুক চালিয়ে ডাকাতেব হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে বৌঠান।

আঃ বাঁচলাম, বললেন বিলাসবতী, তাহলে বুড়ো বয়েসে আমাকে রক্ষা করার জন্যে তোমাব দাদাকে আর বেগ পেতে হবে না।

আদালতে বিচার চলছিল কিছুদিন ধরে। ফলমন হত্যার মামলা। নানা সাক্ষীসাবুদ নিয়ে ছুটোছুটি করছিলেন হিরণ্যগড়ের রাজা দুর্লভ রায় কিন্তু কোন দিক থেকেই আশার আলো তিনি দেখতে পেলেন না।

গম্ভীর হয়ে আদালত থেকে ফিরে এলেন দুর্লভ রায়। মুখ দেখে বোঝা গেল কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে।

ইংরাজ নীলকরেরা একজোট হয়ে দুর্লভ রায়কে ফলমন হত্যার দায়ে দায়ী করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিচারক ইংরাজ, সুতরাং এই মামলা থেকে কোনরকমে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব।

দুর্লভ রায় এসে দাঁড়ালেন অন্দর মহলে। সেখানে রানী বিলাসবতী দেবরের সঙ্গে রসালাপ সহ পান সাজতে ব্যস্ত ছিলেন।

হঠাৎ গৃহকর্তাকে গম্ভীর মুখে ঢুকতে দেখে দুজনেই একটু চিন্তিত হল।

দুর্লভ রায় বললেন, বিচারের যা গতি, তাতে নিজেকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।

বিলাসবতী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর চিন্তাভারাক্রান্ত মুখখানার দিকে।

রাজা রায় বলল, রায়ের ফলাফল বের হতে তো এখনো যথেষ্ট দেরি আছে।

তা হয়তো আছে কিছু সময়, কিন্তু বিচারকের মতিগতি দেখে ফলাফল অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

বিলাসবতী বললেন, কি রকম ?

খোঁজ নিয়ে জানলাম, বিচারক প্রতিদিন প্রায় প্রতিটি নীলকর সাহেবের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াচ্ছে।

একটু থেমে বললেন, আবার শুনলাম, এই বিচারকটি হেপবার্নদের পারিবারিক বন্ধু।

রাজা রায় কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ল। আজ কিছুদিন ধরে সে মিশেছে অ্যানার সঙ্গে। তারা পরস্পরে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। যতটুকু তার মনের ছবি সে দেখেছে তাতে শঠতার কোন চিহ্ন আছে বলে মনে হল না তার।

প্রথম দিনের সেই সাদর আমন্ত্রণ আজও যেন কানে বাজতে লাগল রাজা রায়ের। কিন্তু দাদার সামনে এ বিষয় নিয়ে কোন আলোচনাই সে করতে পারল না।

দুর্লভ রায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিলাসবতী—আমার কি হবে ভাই!

রাজা রায় জোরের সঙ্গে বলল, আমি থাকতে দাদার কোন ভয় নেই বৌদি।

বিলাসবতী জানতেন, রাজা রায় দাদা-অন্ত-প্রাণ, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এই দেবরটির দ্বারা স্বামীর কি সুবিধে হবে তা বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। সহসা তাঁর মনে একটি আশার আলো ফুটে উঠল। তিনি রাজা রায়ের হাত ধরে বললেন, আচ্ছা ভাই,

তোমার সেই মেমসাহেবটিকে ধরে কিছু করতে পার না ?

রাজা রায় চিন্তিত হল। প্রার্থনা সে জীবনে কোনদিন কারো কাছেই করেনি। তবু বৌঠানের অসহায় চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বলল, দেখব কি করা যায়।

সে রাতে হেপবার্নের বাগানেই রাজার যাবার কথা। যথারীতি চাঁদের আলোয় কুমার বাহাদুর চলল অভিসারে। নৌকো পেঁছিল সেই গুপ্ত সুড়ঙ্গের কাছে। তেমনি মোমের বাতিটি জেলে একটি মূর্তি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। উচু-নীচু পথ পেরিয়ে সেই রহস্যময়ী রাজা রায়কে আনল বাগানের ভেতর। দুটি ঘোড়া প্রস্তুত ছিল সেখানে। ইঙ্গিত করল তার একটিতে কুমার বাহাদুরকে ওঠার জন্যে।

দুজনে আজ আর বসল না কোথাও। বাগানের দীর্ঘ গাছগুলোর ছায়া মাড়িয়ে ওরা চলল খোলা প্রান্তরের দিকে। বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত সে প্রান্তর। বাঁয়ে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা। ওপারে ধু ধু বালুচর কেমন চাঁদের আলোয় স্নান করছে। দূরের নীল পাহাড় অস্পষ্ট দেখা যায়।

রাজা,—কতক্ষণ আর কোন কথা বলতে পারল না অ্যানা।

শুধু এই ডাকটি নির্জন প্রান্তরে দুটি নরনারীর হৃদয়ে ফিরে ফিরে বাজতে লাগল।

রাজা ভাবল, কোন সুদূর-লোক থেকে এই ডাকটি ভেসে আসছে। কত যুগের কত প্রণয়ের সুখদুঃখের স্পর্শ মাখানো এর মধ্যে।

কথা বলছ না যে ?—ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে রাজার দিকে তাকাল অ্যানা।

আজ তোমার কথা শুনব বলেই এসেছি অ্যানা, কিছু বলার জন্যে নয়।

আজ এই রাত যেন আমাদেরই জন্যে সৃষ্টি হয়েছে, রাজা।

এই প্রান্তর, এই পথচলা-সবকিছুই !

আর.আমরা কিসের জন্যে এখানে মিলেছি রাজা ?

কোন দ্বিধা না করে রাজা রায় বলল, পরস্পরকে পাবার জন্যে। শুধু পাওয়া নয় নিবিড় করে পাবার জন্যে।

আবার ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল অ্যানা। বলল, চল ফেরা যাক।

কোথায় ফিরবে অ্যানা ? যদি আমরা আর না ফিরি ?

ফিরতে হয় রাজা। পুরুষ স্বভাবে যাযাবর হলেও নারী নয়।

এই রোমাঞ্চে-ভরা রাত আমরা আর কি ভাবে অনেক বেশী করে উপভোগ করতে পারি অ্যানা ?—রাজার গলায় ঈষৎ অনুযোগের সুর।

তুমি আমার বাগানে আজ ভায়োলিন বাজাবে, আর আমি তা শুনব—বলল অ্যানা।

ওরা আবার ফিরে এলো হেপবার্নের বাগানে।

আজ অ্যানা ওকে নিয়ে এলো বাগানের একটি প্রান্তে। এখানে কোনদিন আসেনি রাজা রায়। একটি উঁচু পাথরের ঢিবি, তার ভেতর দিকে বেশ কিছু অংশ ফাঁপা। গুহাব মুখেই উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় একটি আশ্চর্য মূর্তি দেখতে পেল রাজা রায়। একটি উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ, হাতে তার বীণা-জাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্র। সামনে চলতে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়েছে কোন কারণে। রাজা রায় দেখল, ঐ মূর্তিটির পেছনে নতজানু হয়ে রয়েছে একটি নারীমূর্তি। মুখে তার ব্যথার সকরুণ প্রলেপ। দুটি হাত তার সামনের দিকে প্রসারিত।

অ্যানা বলল, এইখানে বসে আজ বীণা বাজাও রাজা ; আমি দেখব কি জাদুতে তুমি ঘুম এনে দাও চোখে।

অ্যানা আগেই ভায়োলিনটি রেখে গিয়েছিল ঐ মূর্তির পায়ের তলায়। সেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে তুলে দিল রাজার হাতে।

রাজা ছড়ি টানল, আর অমনি ঘুমন্ত সুরেরা জেগে, উঠল। কিন্তু প্রভাতে ঘুম ভাঙলেও যেমন দেহে জড়িয়ে থাকে একটি অলস বিধুরতা, রাজার রাগিণী ছড়াতে লাগল তেমনি বিষণ্ণতার সুর।

তন্ময় হয়ে শুনছে অ্যানা। শুনতে শুনতে সত্যিই কখন সবুজ তৃণের গালিচায় ঢেলে দিয়েছে দেহখানা। চোখ দুটি তার নিবিষ্টতায়

বার বার বন্ধ হয়ে আসছে।

অন্য এক জগতে প্রবেশ করছে সে সেখানে সুর শুনে ক্লান্তি নেই। অনন্ত জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি সেখানে প্রেমিকার মগ্ন মধুর মুখখানিকে কুমুদের মত ফুটিয়ে তোলে। ঝরিয়ে দেয় দুটি চোখ থেকে অশ্রুর মুকুল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে উঠে বসল অ্যানা। স্বপ্নের আশ্চর্য প্রাসাদটা যেন খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল তার। কখন সুর থেমে গেছে ভায়োলিনের। রাজা রায় তার কপোলে এঁকে দিয়েছে নিবিড় প্রণয়চিহ্ন।

কতক্ষণ একান্তে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অ্যানা হেপবার্ন। মনে হল কি এক দুঃসহ যন্ত্রণায় বিক্ষত হচ্ছে সে। তারপর তাকাল সে রাজা রায়ের দিকে করুণ এক দৃষ্টি মেলে।

চমকে উঠল রাজা রায়। পাশে ঐ গুহার ভেতর যে নারীমূর্তি তার চাহনির সঙ্গে অদ্ভুত এক সাদৃশ্য খুঁজে পেল অ্যানা হেপবার্নের চাহনির।

তুমি জান, রাজা, ওটি কার মূর্তি?—অত্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল অ্যানা।

মাথা নাড়ল রাজা রায়।

অ্যানা বলে চলল,—ঐ মূর্তি এক আশ্চর্য বীণকারের, নাম তার অরফিউস। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে গিয়েছিল মরণের রাজ্যে। সেখানে মৃত্যুর রাজা ও রানীকে বীণা শুনিয়ে প্রার্থনা করে নিয়েছিল একটি দুর্লভ বর। সেই বরে সে পারবে তার প্রিয়তমা পত্নীকে এই মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু মৃত্যুর রাজা তার কাছে একটি শর্ত রাখলেন। সে নিয়ে যেতে পারবে ঠিকই, কিন্তু যতক্ষণ মৃত্যুপুরীর পথে থাকবে ততক্ষণ শুধু সামনের দিকেই পারবে সে তাকাতে। পিছু ফিরলেই সে হারাবে তার ভালবাসার পাত্রীকে।

অরফিউস মহা আনন্দে মগ্ন হয়ে চলল তার বীণাটি বাজিয়ে। আর তার পেছনে পেছনে অনুসরণ করে চলল তার প্রিয়তম। কিন্তু একি হল! সহসা বীণা থেমে গেল অরফিউসের। কি এক পাওয়ার

নেশায় পেয়ে বসল তাকে। পৃথিবীর মাটিতে পা দিতে না দিতেই ভুলে গেল সে সুরের জগতের নিবিষ্টতা। সংশয়ে তাকাল পেছনের দিকে। তাকে অনুসরণ করে আসছে তো তার প্রিয়তমা!

বল তো রাজা কি হল এর পর?

অরফিউস হারাল তার স্ত্রীকে।

না শুধু তাই নয়, হারাল তার সবচেয়ে সেরা ধন, শিল্পীর মগ্নতা।

রাজা রায় অস্থির হয়ে উঠল,—কি বলতে চাইছ অ্যানা?

দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হেসে বলল অ্যানা, চন্দ্র অস্তে চলেছে, এখন তোমার আমার ফেরার পালা।

সেদিন বিষণ্ণ মনে রাজা রায় ফিরে গেল হিরণ্যগড়ে। যাবার সময় বলে গেল, সে আবার আসবে, দীর্ঘ দুঃসহ একটি সপ্তাহ পার করে।

অ্যানা বলল, পরম সমাদরে সেদিন সে তাকে বরণ করে নেবে।

বিস্ময়কর একটি ঘটনা ঘটল। হিরণ্যগড় সেদিন ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। কারো মুখে কথা নেই। পুরোহিত শুধু নিয়মরক্ষার্থে পঞ্চপ্রদীপে পূজা করল বিগ্রহের।

বাজল না ঘণ্টা, শব্দ শোনা গেল না কাঁসরের। রানী বিলাসবতী দেবরকে পাশে রেখে জপ করতে লাগলেন বিপদহারিণী মা চণ্ডীর নাম। আজ বিচারের শেষ দিন, জয়পরাজয়ের ভয়াবহ নিষ্পত্তি। তাই শঙ্কায় থমথম করছিল হিরণ্যগড়ের প্রতিটি মানুষ।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে জানালায় প্রায় দৌড়ে এসে দাঁড়ালেন বিলাসবতী।

দুর্লভ রায় নামলেন ঘোড়া থেকে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ঘরে ঢুকেই বললেন, জীবনে এমন বিচিত্র ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াইনি কখ

বিলাসবতী তখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বামীর। রাজা রায় তাকিয়ে আছে দাদার মুখের দিকে অভাবিত কিছু শোনার প্রত্যাশায়।

অ্যানা হেপবার্ন আমাকে রক্ষা করেছে। রক্ষা করেছে রায়বংশের সম্মান!

কি রকম?

আদালতে এসে সে নিজেকে ফলমনের হত্যাকারী বলে এজাহার দিয়ে গেছে। তাদের তাসের ঘর ভেঙে গেল দেখে হায় হায় করে উঠল সমস্ত ইংরাজ নীলকররা।

কথাটা শুনে বিলাসবতীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অ্যানা হেপবার্নকে মনে মনে আশীর্বাদ না জানিয়ে পারলেন না।

বলতে লাগলেন দুর্লভ রায়,--শুধু এই একটি মহিলাব জন্যেই আজ ইংরাজ জাতটা আমার চোখে অনেক বড় হয়ে গেল। ওদের কূটকৌশল অবিচার, অত্যাচার আমার মনটাকে কিছুদিন ধরে বিষাক্ত করে তুলেছিল কিন্তু এই মেয়েটি ঠিক যেন আমাদের দেশের মেয়েব মতো মমতার প্রলেপ দিয়ে আমার অনেকদিনের পুবনো সেই ক্ষতটাকে সারিয়ে দিলে।

রাজা রায় উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। দাদার কথা শেষ হতেই সে প্রশ্ন করল, কিন্তু বিচারে কি হল অ্যানার?

সাক্ষীসাবুদ এনেছিল সে। প্রমাণ হল, আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে সে বাধ্য হয়েছিল। বিচারক তাব স্বপক্ষেই বায় দিলেন। আর হিংস্র হায়েনার মত অ্যানা হেপবার্নের দিকে তাকাতে লাগল নীলকর সাহেবের দল।

আমার মনে হচ্ছিল, যেন একটা সিংহী বাঘেদের মুখ থেকে শিকারটা ছিনিয়ে নিল, আর ক্ষুধিত নেকড়েগুলো তার দিকে তাকাতে লাগল ভীষণভাবে, কিন্তু সামর্থ্য নেই ছিনিয়ে নেবার।

অ্যানার ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধায় রাজা রায়ের মন আজ ভরে উঠল। সে কয়েকবারই চেষ্টা করেছে দাদার বিপদের কথাটা উত্থাপন করবে অ্যানার কাছে, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। দাদা তাকে আক্রমণ করেছে, এ অবস্থায় তার জন্য কিছু বলার অর্থই হল কৃপা ভিক্ষা করা। এ নিয়ে নিজে সে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে কিন্তু আত্মসম্মান হারিয়ে কিছু বলতে পারেনি কোনদিন।

আজ অ্যানাই রাখল তার সম্মান। তাকে আপন মুখে বলার হীনতা থেকে মুক্তি দিল সে।

আদালত থেকে ফিরে এসে সেদিন সন্ধ্যায় অ্যানা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সে একা একা পায়চারি করতে লাগল বারান্দায়। বেরিয়ে গেল একসময় বাগানে। প্রতিটি মূর্তি, প্রতিটি গাছপালা আজ তার চোখে নতুন এক অর্থ নিয়ে দেখা দিল। মূর্তি-গুলো যেন বলতে লাগল, আমরা কিছু নয় তুমি আমাদের সুন্দর চোখে দেখ বলেই আমরা সুন্দর।

দীর্ঘ গাছগুলি বলতে লাগল, আমাদের মতো ফুল দাও, ফল দাও, এমনকি সর্বস্ব দিয়ে সেবা কর সকলের !

আজ কি এক পূর্ণতা অ্যানার মনটিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না এর কারণ, কিন্তু মনটা তার ক্ষণে ক্ষণে প্রসন্ন হয়ে উঠছে। এ কিসের আনন্দ, এ কিসের পরিতৃপ্তি !

ফিরে এলো অ্যানা ঘরে। ঢুকল স্টাডিতে। একটি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে ছিল মৈত্রেয়ী। কোলের ওপর তার একটি বই খোলা। ঢলে পড়েছে মুখখানা বাঁ হাতের ওপর।

পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কতক্ষণ তাকিয়ে দেখল অ্যানা মৈত্রেয়ীর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে। কি এক করুণ বেদনার ছাপ পড়েছে সে মুখে। জ্বলছে সেজের বাতি, অ্যানার মনে হল, চকচক করছে মেরীর চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল।

কোলের খোলা বইখানা সন্তর্পণে তুলে নিল অ্যানা। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতার বই। লুসির ওপর লেখা কবিতাটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে মৈত্রেয়ী। লেখাপড়ার জগতে তাকে অ্যানাই নিয়ে এসেছিল। এ জগতে এলেই নাকি সবকিছু ভুলে থাকা যায়। অ্যানার মনে হল, মেরীকে সে সাজাবে এখুনি।

অমনি মৈত্রেয়ীর হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল অ্যানা।

চমকে উঠে পড়ল মৈত্রেয়ী। লজ্জা পেয়েছে সে। পড়ন্তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া তার কোনরকমেই শোভন হয়নি।

অ্যানা বলল, আসবে একটু আমার সঙ্গে ওপরে ?

মৈত্রেয়ী কোন কথা না বলে চলতে লাগল। অ্যানার পেছন পেছন উঠে এলো সে শোবার ঘরে।

আমি তোমাকে সাজাব বলে নিয়ে এলাম,—অ্যানা বলল।

এ আবার কি পাগলামিতে পেল তোমাকে!—মৈত্রেয়ী বলল।

শুনল না অ্যানা কোন কথা। বলল, আজ খুলে ফেল আমার পোশাকগুলো।

হেসে বলল মৈত্রেয়ী, পরব কি ?

অ্যানা আলমারির ভেতর থেকে বের করল মৈত্রেয়ীর প্রথম দিনের সেই বিয়ের চেলিখানা।

ভুলেই গিয়েছিল মৈত্রেয়ী তার কথা। হঠাৎ শাড়িখানা দেখে বিষণ্ণ হয়ে এলো তার মুখ।

বলল, মাপ কর দিদি, ও শাড়ি আর আমি পরব না।

অ্যানা মিনতি করে বলল, মেরী শুধু আজ রাতটির জন্যে কি তুমি আমার এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখতে পার না ?

শাড়ি পরতে হল মৈত্রেয়ীকে। এদেশীয় মেয়ের সাজে সাজিয়ে অ্যানা তাকে কত রকম করে দেখতে লাগল। দেখে দেখে যেন আশ মেটে-না তার।

রাত বেড়ে চলেছে, শুভরাত্রি জানিয়ে অ্যানা আর মৈত্রেয়ী বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে।

নদীতীরে এসে দাঁড়াল অ্যানা। হাতে নেই অভিসারের সেই পথ-দেখানো দীপবর্তিকা। জ্যোৎস্নার ম্লান আলোয় কিছু দূরের মানুষকে চেনা যায় না। দাঁড়িয়ে রইল অ্যানা নদীর দিকে চেয়ে।

নদী বয়ে যাচ্ছে ; কত নৌকো ভেসে যায়, কত প্রান্তর শস্যে পূর্ণ

হয়ে ওঠে। 'নদী দান করে, কিন্তু ফিরে কিছুই নেয় না। সে শুধু সাক্ষী হয়ে আছে বিচিত্র জীবনপ্রবাহের।

ঐ তো নৌকো আসছে; অ্যানা জানে এ কার নৌকো। তবু সে নিরাসক্তের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সেদিকে। আজ তার সমস্ত প্রাণ ঐ নদীর ধারা হয়ে বয়ে যেতে চাইছে

রাজা রায় উঠে এলো। চোখে পড়ল না তার সুড়ঙ্গপথে সেই চির-অভ্যস্ত আলোকবর্তিকা।

এগিয়ে এলো অ্যানা,—এই যে, এসো রাজা।

প্রসারিত করল সে তার হাতখানা। রাজা রায় ধরল সে হাত। দুজনে প্রবেশ করল সুড়ঙ্গের ভেতর।

কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না অ্যানা!

আমি তো রয়েছি তোমার পাশে; আমার হাত ধরেই উঠে এসো।

তারা এসে দাঁড়াল কুঠির বাগানের মাঝখানে। বসল একটি বেদির ওপর।

রাজা অ্যানার হাতখানা নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল, তুমি সুখী অ্যানা?

রাজার হাতের ভেতর থেকে অ্যানা টেনে নিল না তার হাত। সারা দেহে শুধু কি এক দুঃসহ আনন্দের তরঙ্গ খেলতে লাগল:

এবার আমার দেবার পালা রাজা।

রাজা রায় বলল, আমি সেই অমূল্য রত্ন পাবার আশাতেহ কাঙালের মত দিন গুনছি অ্যানা।

উঠে দাঁড়াল অ্যানা হেপবার্ন। ধরল রাজা রায়ের হাতখানা নিজের হাতের ভেতর। চলতে লাগল কুঠির পথে। বিস্মিত হল রাজা রায়। তারা এসে দাঁড়াল বিরাট কুঠিবাড়ির সামনে। একটিও আলো জ্বলছিল-না কোথাও। অ্যানা রাজা রায়ের হাত ধরে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

আজ সব সেজের বাতি নিভিয়ে দিতে বলেছি রাজা। এই রাতে তোমার হৃদয়ে রোশনাই জ্বলছে না?

রাজা রায় উঠছে, পা দুটো কাঁপছে তার। হিরণ্যগড়ের ছোটকুমার বাহাদুর আজ এক বন্দী বিহঙ্গ।

অ্যানা, মনে হচ্ছে আমি এক অগ্নিশিখা স্পর্শ করে রয়েছি যে দীপ্তি দেয়, পথ দেখায়, আবার দাহের জ্বালা ধরিয়ে দেয় সারা দেহে।

হাসির তরঙ্গ তুলল অ্যানা হেপবার্ন। দুর্গের মত গোলগম্বুজে কতক্ষণ তা ফিরে ফিরে বাজল। রাজা রায়ের হৃদয়কে বার বার সে আঘাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল।

আজ তোমাকে আমার সবসেরা রত্নটি দেব রাজা। আমার বড় দুঃখের, বড় যন্ত্রণার সঞ্চয় সেটি,—রাজার কানের কাছে মুখ এনে চাপা-গলায় বলল অ্যানা।

রাজা রায় অনুভব করল পায়ের তলা থেকে তার শেষ সিড়িটা সরে গেল। আঁকাবাঁকা বারান্দা পেরিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল যেখানে সেটি সম্ভবতঃ অন্দরমহলের একটি শয়নকক্ষ।

অতি সন্তর্পণে অ্যানা রাজাব হাত ধবে ঢুকলো সেই ঘবে। রহস্যময়ী অ্যানা ইশারায় শব্দ করতে বারণ করল রাজাকে।

কিছু দেখতে পাচ্ছ? ভাল করে চেয়ে দেখ ত দেখি।

রাজা রায় তাকিয়ে রইল সেই অন্ধকারে। হাত ছেড়ে দিয়েছে অ্যানা।

দেখ দেখি চেয়ে কোন হারানো রত্নের সন্ধান পাও কি না?

জ্বলছে, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, রাজা রায়ের বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার, চরম সম্মান। হারানো হীরক অঙ্গুরীয়।

কিছুক্ষণ পরে আলো এসে পড়ল অন্ধকার সরিয়ে। অ্যানা ঘরে ঢুকল একটি দীপ হাতে নিয়ে। ঘুম ভেঙে শয্যার ওপর ততক্ষণে উঠে বসেছে একটি মূর্তি। অ্যানা কাছে এগিয়ে গেল তার। তুলে ধরল মুখের কাছে দীপশিখা। অকম্পিত দীপের আলোয় বিমূঢ়বিস্ময়ে দুজনে দেখল দুজনকে।

রাজা রায় দেখল, তারই দেওয়া হীরের আংটি পরে বসে আছে হিরণ্যগড়ের হারানো বধূ।

বিস্ময় ভাঙতে না ভাঙতেই সে চীৎকার করে উঠল,—না, এ হয় না না, এ হয় না!

কোমলকণ্ঠে বলল অ্যানা, কি হয না রাজা! তুমি না বলেছিলে, |মার সবসেবা বত্নটি নেবার জন্যে তুমি কাঙালের মত প্রতীক্ষা কবে ছ। মেরী আমাব সেই শ্রেষ্ঠ বত্ন। তোমার জন্যে আমি অতি যত্ন ব তাকে এতকাল গচ্ছিত বেখেছি আমাব কাছে। তুমি একে গ্রহণ ব আমাকে মুক্তি দাও বাজা।

কাবো মুখে কথা নেই, অখণ্ড নীববতা।

শেষ বাতে যখন জ্বলজ্বল কবে জ্বলে উঠল পূব আকাশে শুকতাবা, ।ন দেখা গেল নদী পাব হযে দুটি মূর্তি চলেছে অশ্বাবোহণে। হিরণ্য-ড়েব হাবানো বধূ স্বামীব সঙ্গে ফিবে চলেছে আপন সংসাবে।

আব অন্যদিকে আব একটি মূর্তি উঠে বসল তাব ঘোড়ায। কুঠি কে বেব হয়ে এসে দাঁড়াল বাইবেব ফটকেব সামনে।

ঘোড়া থেকে নেমে ফটকেব স্তম্ভেব গাযে আটকানো তাব নামের কটি তুলে নিযে সেখানে বসিযে দিল আব একটি নাম—'মে·া য়'।

তাবপব ঘোড়ায় চডে প্রান্তবেব বুকে অদৃশ্য হযে গেল।

কুঠিব দীর্ঘ গাছগুলো, সুবর্ণবেখা নদী, উঁচু পাথবেব টিলা কতক্ষণ র শুনতে লাগল ঘোড়াব খুবেব বিলীযমান ধ্বনি।

॥ আমাদের প্রকাশনায় আরও কয়েকখানি উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রাচীর ও প্রান্তর …

অজিতকৃষ্ণ বসু

শেষ বসন্ত …

আশাপূর্ণা দেবী

অন্য মাটি অন্য রং …

লঘু-ত্রিপদী …

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একই বৃন্ত …

জ্যোতির্ময়ী দেবী

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা …

জ্যোতিরিন্দ্র রায়

প্রণয় এক প্রাণ-শিল্প …

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

বিহঙ্গের গান …

দিলীপকুমার রায়

অঘটনের শোভাযাত্রা (একত্রে তিনখানি উপন্যাস) …

দীপক চৌধুরী

এক যে ছিল রাজা …

দেবব্রত রেজ

প্রাণ-পাথেয় …

স্বপ্নলোকের চাবি —